শ্রীমান সুব্রত রায় চৌধুরীর
করকমলে

কালপঞ্জিকা

নাম		খৃষ্টপূর্ব কাল
থালেস (Thales)	আনুমানিক	৬৪০ — ৫৪৮-৫
অ্যানেক্জিম্যাণ্ডার (Anaximander)		৬১১-১০ — ৫৪৭-৬
অ্যানেক্জিমেনিস (Anaximenes)	আনুমানিক	৫৮৮ — ৫২৪
পিথাগোরাস (Pythagoras)	আনুমানিক	৫৮০-৭০ — ?
জেনোফেনিস (Xenophanes)	আনুমানিক	৫৭৬-২ — ৪৮০
পারমেনাইডিস (Parmenides)	আনুমানিক	৫৪৪-০ — ?
জেনো (Zeno)	আনুমানিক	৫১৯-৫ — ?
হেরাক্লিটাস (Heracleitus)	আনুমানিক	৫৩৫ — ৪৭৫
এম্পিডক্লিস (Empedocles)	আনুমানিক	৪৯৫-০ — ৪৩৫-০
ডিমক্রিটাস (Democritus)	আনুমানিক	৪৬০ ? — ?
অ্যানেক্জাগোরাস (Anaxagoras)		৫০০ — ৪২৮
প্রোটাগোরাস (Protagoras)	আনুমানিক	৪৮০ — ৪১০
জর্জিয়াস (Gorgias)	আনুমানিক	৪৯০-৮০ — ?
সক্রেটিস (Socrates)		৪৭০ — ৩৯৯
প্লেটো (Plato)		৪২৭ — ৩৪৭
অ্যারিস্টটল (Aristotle)		৩৮৪ — ৩২২

প্রথম যুগ

প্রাকৃতিক জগতের কথা

এই শব্দস্পর্শগন্ধরূপময় পৃথিবী— এ এল কোথা থেকে? আর এর বুকে যারা ভিড় করে রয়েছে সেই জীব-জন্তু-মানব— তারাই বা এল কোথা থেকে? মানুষের মনের এ একটা চিরন্তন প্রশ্ন। গ্রীকদের মনও তাই এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যায় নি, যেতে পারে নি। মানুষ জানতে চায় জগতের ও জীবের কারণ কি— কে সৃষ্টি করল এদের, বা কি দিয়ে সৃষ্ট হল এরা? একটা যুগ ছিল যেটা হচ্ছে মানবসভ্যতার শৈশবকাল— তখন এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মানুষ তার রাশছাড়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করত— বলত, আমাদেরই মত একরকম প্রাণী, যাঁরা জরামরণমুক্ত, যাঁরা শক্তিতে সৌন্দর্যে বুদ্ধিতে জ্ঞানে আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক বড়— তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন এই জগৎসংসার। মানুষ তাঁদের নাম দিল দেবতা।

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারল এই দেবতা শুধু কল্পনার স্বর্গেরই জীব— পৃথিবীটা সত্যিই তাঁর তৈরি কিনা সে বিষয়ে কোনো বুদ্ধি-গ্রাহ্য প্রমাণ নেই। তখন জগৎ-সম্বন্ধে তার প্রশ্নের মোড় ঘুরে গেল—সে আর জানতে চাইল না, কে সৃষ্টি করেছে— সে শুধু জানতে চাইল, কি দিয়ে জগৎটা সৃষ্ট হয়েছে, কি সেই আদিম উপাদান যার ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়েছে এই বিশ্বচরাচর।

শুরু হল মানুষের দার্শনিকতার। মানুষ কল্পনাকে এড়িয়ে তার বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে শিখল। এ-ছাড়া-জগৎ-তৈরি-হতে-পারত-না এমন একটি উপাদান সে খুঁজতে লাগল, খুঁজতে লাগল সেই আদিম উপাদানকে যা জগৎ-সৃষ্টির মূলে রয়েছে।

সে উপাদান কি, গ্রীকদর্শনে এ প্রশ্নটা প্রথম তুললেন থালেস। থালেসের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকমন পুরাণের গল্প ফেলে বিচারবুদ্ধি বিশ্লেষণের পথ নিল। এই পথটা দর্শনের পথ বলেই থালেসকে গ্রীকদর্শনের পথিকৃৎ বলা হয়। থালেস এবং তাঁর পরবর্তী দুজন দার্শনিক মিলেশীয়ান দার্শনিক নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন, কারণ এঁদের জন্ম মিলেটাস নামক একটি গ্রীক কলোনিতে।

হোমারের মতে ওশেনাস (Oceanus) দেবতা হচ্ছেন সব কিছু সৃষ্টির আদিজনক। আর তাঁর মতটাই ছিল তখনকার গ্রীকদের বদ্ধমূল বিশ্বাস। থালেস এসেই এই দেবতাটির দেবত্ব ঘুচিয়ে দিলেন, ওশেনাস তাঁর হাতে হয়ে পড়ল শুধুই 'জল'। তাঁর মতে অপ্ বা জলই হল সেই আদিম উপাদান যার থেকে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। তবে জল বলতে আমরা সাধারণত চোখে-দেখা-যায়, স্পর্শ-করা-যায়, পান-করা-যায় যে জলকে বুঝি, সে জলকে তিনি নির্দেশ করেন নি। যে পদার্থ সিক্ততার কারণ জল বলতে তিনি সেই পদার্থকেই বুঝিয়েছিলেন। কেন যে তিনি জলকেই আদিম পদার্থ ব'লে ঘোষণা করলেন তার সঠিক কারণ জানা যায় না; তবে বড় বড় দার্শনিকদের ধারণা, তিনি জীবনের পক্ষে জলের প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র তাই দেখেই এ-কথা বলেছিলেন। উদ্ভিদের জীবনই হোক বা প্রাণীর জীবনই হোক, আর্দ্রতাই তার জন্ম ও পরিপুষ্টির কারণ। থালেসের এই মতবাদের আরও একটা বড় কারণ যে তিনি জলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন অফুরন্ত গতি আর নূতন নূতন আকার নেবার অলৌকিক ক্ষমতা। বিশেষ ক'রে এই দুটো গুণের জন্যই তিনি জলকে 'দেবতা' আখ্যাও দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দেবত্ব আরোপ ক'রে তিনি এমন কিছু বোঝান নি যাতে জল আবার সেই সাবেক কালের সর্বশক্তিসম্পন্ন ওশেনাস দেবতা হয়ে পড়তে পারে।

আদিম পদার্থ খুঁজতে খুঁজতে থালেস পেলেন জল; কিন্তু তাঁর পরবর্তী দার্শনিক **আনেকজিম্যাণ্ডার** জলকে জগতের আদিম উপাদান ব'লে গ্রহণ করতে পারলেন না। জল—সে তো একটা নির্দিষ্ট পদার্থ—সে-ই যদি এই বিশাল জগতের সৃষ্টির আদিম উপাদান হয়, তবে বুঝতে হবে যে জগৎকে সৃষ্টি করতে করতে এই আদিম উপাদানটি আপনাকে নিঃশেষিত ক'রে ফেলেছে, তার আর কিছুই বাকি নেই। কিন্তু তা তো হতে পারে না। জগতের কারণ যেটা হবে, সেটা হবে অসীম—শেষ তার কখনই হবে না, তার মধ্যে থাকবে অনেক বড় বড় সৃষ্টি করবার অশেষ ক্ষমতা, অফুরন্ত উপকরণ! সৃষ্টি যত বড়ই হোক না কেন, আদিম উপাদান কখনই এই সৃষ্টিকার্যে আপনাকে একেবারে শেষ ক'রে ফেলতে পারে না—যে ফেলে, বুঝতে হবে সে আদিম পদার্থ নয়। অ্যানেকজিম্যাণ্ডারের মতে জগতের আদিম পদার্থ হল **অসীম-একটা-কিছু** (the unlimited)। এই অসীম-একটা-কিছুকে আমরা জগতের কোনো একটা নির্দিষ্ট পদার্থের সঙ্গে (যেমন জলের সঙ্গে) এক ক'রে দেখতে পারি না। জগতের মধ্যে আমরা যে বিচিত্রতা দেখছি, তা কখনই আমাদের জানাশোনা একটিমাত্র নির্দিষ্ট পদার্থের গর্ভ হতে জন্ম নিতে পারে না। অসীম-একটা-কিছু অনির্দিষ্ট—আর অনির্দিষ্ট, অসীম ব'লেই এই আদিম উপাদান অনিবার গতিতে যা-ইচ্ছে সেই নির্দিষ্ট রূপই গ্রহণ ক'রে চলতে পারে। এই অসীম-একটা-কিছু শুধু যে অনির্দিষ্ট তাই নয়—এ অনাদি, অশেষ, অমর—সমস্ত জগৎ, অণু থেকে বৃহৎ, সব ছেয়ে এর অধিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, যে চলমান জগৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার গতির পরিচালনাও করছে এই অসীম-একটা-কিছু। কেমন ক'রে জগৎ তার নানা গুণ নিয়ে এই আদিম উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তারও একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা এই দার্শনিক করেছেন। এই নির্বিশেষ নির্গুণ অসীম-একটা-কিছুর মধ্য থেকে প্রথমে উদ্ভূত হয়েছে দুটি বিরুদ্ধস্বভাব গুণ—উষ্ণ ও

শীতল। এই দুটি বিপরীতধর্মী গুণের সংঘর্ষের ফলে জন্ম নিল তরল পদার্থ। এই তরল পদার্থই হচ্ছে থালেসের জল। তারপর ধীরে ধীরে এই তরল পদার্থ থেকে উদ্ভূত হ'ল আমাদের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী। পৃথিবীটা প্রথমে ছিল তরল; ক্রমে ক্রমে যখন সে কঠিন হল, তার বুকে আবির্ভাব হল প্রাণীর। প্রাণীরা প্রথমে মৎস্য ছিল, তারপর বিবর্তনের ফলে এই মৎস্য থেকেই সৃষ্ট হল মানুষ আর নানাবিধ জন্তু জানোয়ার। ধারণাটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু এরই মধ্যে বর্তমান বিবর্তনবাদের আভাস পাওয়া যায়— কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির মত তাই।

আদিম পদার্থ খোঁজবার জন্য থালেস এই প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যেই ঘুরেছেন এবং যে পদার্থকে আদিম ব'লে নির্দেশ করলেন, সে পদার্থটিও জগতেরই একটি প্রত্যক্ষ পদার্থ; যদিও ঠিক প্রত্যক্ষ বলতে যা বোঝা যায় থালেসের জল তা নয়, কারণ জলের সূক্ষ্মতম রূপটিকেই তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আনেকজিম্যাণ্ডার প্রত্যক্ষ জগতের সৃষ্টিকারী উপাদান খুঁজতে খুঁজতে চ'লে গেলেন একেবারে প্রত্যক্ষ জগতের বাইরে অপ্রত্যক্ষ জগতে, যে জগৎকে আমরা বলতে পারি 'ধারণা'র জগৎ। এ জগৎটাকে আমরা শুধু কেবল আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি— কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে একে কখনই আমরা এক ক'রে দেখতে পারি না। আনেক্‌জিম্যাণ্ডার আদিম পদার্থরূপে অসীম একটা কিছুকে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না যার সীমা নেই, শেষ নেই, আরম্ভ নেই, ধ্বংস নেই। তাই তিনি 'ধারণা'র জগৎ থেকে আনলেন তাঁর আদিম মূল উপাদান।

আনেক্‌জামেনেস তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকের মতবাদের একটি অংশ মেনে নিলেন— তিনিও এ-কথা বিশ্বাস করলেন যে আদিম মূল পদার্থকে অসীম হতেই হবে। কিন্তু তাই ব'লে জানি-না শুনি-না এমন 'ধারণা'র জগৎ থেকে সেই পদার্থকে খুঁজে আনতে হবে, তা তিনি মানলেন না। আমাদের প্রতিদিনকার

এই যে জগৎ, এই জানাশোনা জগতেই সে পদার্থ রয়েছে। আনেক্‌জামেনিস 'মরুৎ'-এর মধ্যেই দেখতে পেলেন সে পদার্থকে। তাঁর মতে **মরুৎ** হল জগতের আদিম পদার্থ। 'মরুৎ'-এর সাহায্যে তিনি থালেস এবং আনেক্‌জিম্যাণ্ডারের মতবাদকে মেলাতে চাইলেন। জলের মত মরুৎও আমাদের জানাশোনা একটি পদার্থ, কিন্তু আরও সূক্ষ্ম; এবং জলের মধ্যে যা নেই, অথচ যেটা মূল পদার্থের একটি অপরিহার্য গুণ, সেই অসীমতাও রয়েছে মরুতের— মরুতের কোনো শেষ বা সীমা আমরা টেনে দিতে পারি না। কেমন ক'রে মরুৎ থেকে এই জগৎ সৃষ্ট হয় তার অনেকটা পরিষ্কার বর্ণনা আমরা পাই আনেকজামেনিসের কাছে। তিনি দুটি প্রক্রিয়ার নাম করেছেন যার মধ্য দিয়ে মরুৎ আপনাকে নানা রূপে পরিবর্তিত ক'রে এই জগৎ সৃষ্টি করে। একটি হচ্ছে অঘনীকরণ (rarefaction), আরেকটি হচ্ছে ঘনীকরণ (condensation)। প্রথমটির মধ্য দিয়ে মরুৎ আপনাকে আগুনে রূপান্তরিত করে। দ্বিতীয়টির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি, জল, মাটি, পাথর ইত্যাদিতে পরিণত করে। এইভাবে এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকার্য চলে।

এই সময়ের কাছাকাছি দিয়ে আরেকটি দার্শনিক মতবাদের উদয় হয়। এই মতবাদ পূর্ণাকৃতি পেয়ে প্রকাশ লাভ করে আরও পারে, কিন্তু যার নামের সঙ্গে এই মতবাদের নাম বিজড়িত, সেই **পিথাগোরাস**-এর অভ্যুদয় এই যুগেই। পিথাগোরাসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তাঁর জীবনের ইতিহাস এখনো তিমির-অন্তরালে। এমন কি, পিথাগোরীয়ান মতবাদ ব'লে যা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা সত্যিই পিথাগোরাসের কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে এ-কথা সত্য ব'লেই মেনে নেওয়া হয় যে, যে ধর্মসংঘের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ পরে আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, সে ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা পিথাগোরাস নিজেই।

জগতের মূলে কি আছে—এই প্রশ্নের উত্তরে পিথাগোরীয়ানরা বললেন যে জগৎসৃষ্টিকার্যের মূলে রয়েছে **সংখ্যা** (number)। জগতের সব জিনিসেরই পরিমিতি (proportion) আছে। সংখ্যা ছাড়া পরিমিতির কোনো অর্থই হয় না— মাপজোক গোনাগুনতি, সব কিছু সংখ্যার দ্বারাই সম্ভব। জাগতিক জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা আরো একটি জিনিস দেখতে পাই— ক্রম (order)। ক্রমবিভাগ মানেই একটির পর আরেকটি, তারপর আরেকটি। সংখ্যার দ্বারা জিনিসগুলি যদি প্রযোজিত না হ'ত, তবে কি তাদের এমনি করে ক্রমানুসারে ভাগ করা যেত? আর, সংখ্যার দ্বারা জগতের সব জিনিসই এইভাবে প্রযোজিত ও নিয়মিত ব'লে আমরা জগতে দেখতে পাই সংগতি, সুসম্বদ্ধতা। তাই, পিথাগোরীয়ানরা সংখ্যাকেই জগতের মূল পদার্থ ব'লে গ্রহণ করলেন এবং এই সংখ্যা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে ব'লে জগতের মধ্যে পরিমিতি-ক্রম-সংগতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথা তাঁরা প্রমাণ করলেন।

মতবাদটা অদ্ভুত। যে 'এক দুই তিন' প্রভৃতি সংখ্যার পরিচয় আমরা রোজই আমাদের অঙ্কের বইয়ে, হিসেবের খাতায়, কথাবার্তার মধ্যে পাই, সেই সংখ্যাগুলি থেকেই কিনা উদ্ভূত হয়েছে এই জগৎ! পিথাগোরীয়ানরা তাঁদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে শেষে এমন একটা অদ্ভুত মতবাদের জন্ম দেবেন, এটা ভাবতে আমাদের বিচারবুদ্ধিই কেমন যেন সংকোচ বোধ করে। তাই গ্রীক-দর্শনের কয়েকজন পণ্ডিত (যেমন Scoon প্রভৃতি) পিথাগোরীয়ান মতবাদকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের ব্যাখ্যা যে একেবারে নতুন, তা এঁরা বলেন না—বরং এ কথাই এঁরা বলেন যে এ্যারিষ্টটল এই মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারই ধারাকে অনুসরণ করেছে এদের ব্যাখ্যা। পৌর্বাপর্যসম্বন্ধ দেখে যথাযথ পরিপ্রেক্ষণার বিচার করলে এঁদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

এই ব্যাখ্যাতাদের মতে পিথাগোরীয়ানরা জগৎসৃষ্টির মূলে দুটি উপাদানের

অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, একটি **অসীম** আরেকটি **সসীম**। জগৎকে হয় অসীম নয় সসীম হতে হবে— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ একেবারে অসীমও নয় সসীমও নয়— এই দুই মিলিয়েই তার সত্তা। তাই এই দুটি বিরুদ্ধগুণসমন্বিত জগতের জন্ম দেবার জন্য প্রয়োজন সীমার এবং অসীমতার উভয়েরই। এদেরই সংযোগ থেকে উৎপত্তি হয় জগতের। মৌলিক সসীম পদার্থটিকে তাঁরা 'অগ্নি' বা 'তেজ' ব'লে অভিহিত করলেন, আর অসীম পদার্থটি নাম পেল 'মরুৎ'। সৃষ্টির প্রথমে পুঞ্জীভূতরূপে বিরাজ করছিল অগ্নি— তারপর একদিন সে এল মরুতের সংস্পর্শে, সে যেন নিশ্বাসের মত মরুতকে টানল আপনার মাঝে, যেমন ক'রে আমরা বাইরে থেকে বাতাস টেনে নি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য। এরই ফলে অগ্নির মধ্যে জাগল সৃষ্টির চাঞ্চল্য— সুরু হল পুঞ্জীভূত রূপের ধীরে ধীরে ভেঙে-যাওয়া, আর এই ভাঙনের ভিতর দিয়েই গ'ড়ে উঠতে লাগল জগৎ।

আদিম পদার্থের ভাঙা আর গড়ার এই ধারাটিকে সুবোধ্য করবার জন্য পিথাগোরীয়ানরা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য নিলেন। সে সাহায্য যে তাঁরা নেবেন তা খুবই স্বাভাবিক, কারণ অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁদের প্রীতি ছিল প্রগাঢ়। যে পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে তাঁরা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি-প্রণালীকে ব্যাখ্যা করলেন সেটার নাম টেট্রাক্টিস্ অফ্ দি ডেকাড (Tetractys of the Decad)। ছবি এঁকে পদ্ধতিটিকে এইভাবে বোঝানো যেতে পারে :

●
● ●
● ● ●
● ● ● ●
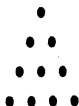
এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এটাই দেখানো হয়েছে যে আমরা যদি প্রাথমিক 'এক' (unit) নিয়ে শুরু করি, তবে তার দ্বিধা বিভাগের ভিতর দিয়েই পাব

'দুই'কে। সুতরাং 'দুই'এর মানে প্রাথমিক 'এক'এর ভাঙন। এমনি ক'রে এটাও প্রমাণ করা যায় যে আদিম উপাদান যে অগ্নি, তার ধীরে ধীরে ভেঙে যাওয়ার ভিতর দিয়েই জগৎ তার নানা জিনিস নিয়ে উদ্ভূত হয়। এখন এই যে জিনিসগুলো তৈরী হচ্ছে, তাদের সকলকেই সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে। শুধু পারে নয়, সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ব'লেই তাদের মধ্যে আমরা ক্রমবিভাগ ও সংগতির প্রকাশ দেখতে পাই। সংখ্যা ছাড়া যে এই ক্রমবিভাগ ও সংগতির ব্যাখ্যান সম্ভবপর নয় তা তাঁরা কেমন ক'রে প্রমাণ করেছেন সে আমরা দেখেছি। তবে, এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা হয়তো সংখ্যার ওপর এত বেশী জোর দিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত মনে হয় তাঁরা যেন এই সংখ্যাকেই জগতের সবকিছুর সারপদার্থ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই জোর দেওয়ার মধ্যেই তাঁদের আসল মতবাদ নিহিত নয়, এবং এই জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের প্রাথমিক মতবাদ— যে মতবাদ অসীম এবং সসীম পদার্থে সংযোগের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে ব'লে ঘোষণা করেছে— সে মতবাদের স্বরূপ একেবারে লীন হয়ে যায় নি। হয়তো কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, এই মাত্র।

গ্রীকরা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। সার্বভৌম দেবতার স্রষ্টরূপের পরিকল্পনা তাদের ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জগতের পরিচালনার কাজে অন্যান্য দেবতাদের অসামান্য সাহায্যও যে আছে, এই ধারণা গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে বর্তমান। কিন্তু মিলেশীয়ান দার্শনিকত্রয়ের মতবাদে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, হয়তো তাঁদের অজ্ঞাতেই, একটি বিদ্রোহের সুর যেন বেজে উঠল। শুধু যে জগতের মূলে কখনো বহুত্ব থাকতে পারে না তা নয়, জগতের গতির পরিচালক যে শক্তি তার আধারও কখনো সংখ্যায় বহু হতে পারে না। যে জিনিস থেকেই জগৎ সৃষ্ট হোক না কেন, তা হবে এক। যে-ই হোক না কেন জগতের পরিচালক, সে হবে এক। কিন্তু এই বিদ্রোহের সুর গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তেমন কঠিন হয়ে মোটেই বেজে ওঠে নি যেমন ক'রে বেজে উঠল ইলীয়েটিক সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা ইলীয়া নিবাসী জেনোফেনিসএর কণ্ঠে। এই দার্শনিক বহুদেববাদের বিরুদ্ধে তুললেন অমোঘ বিদ্রোহ, প্রচার করলেন একেশ্বরবাদ। বহু দেবতার অস্তিত্বে মানুষ বিশ্বাস করে, কেননা তারা সে দেবতাদের আঁকে তাদের নিজেদেরই মত ক'রে। তারা ভাবে, দেবতারা দেখতে শুনতে তাদেরই মত, শুধু কেবল তাদের চেয়ে অনেক গুণে বড়। এটা মানুষের মূর্খতা, আর এই মূর্খতাকে ঠাট্টা ক'রে জেনোফেনিস বললেন, যদি ষাঁড় আর সিংহদের হাত থাকত আর যদি তারাও মানুষের মত চিত্র তৈরি করতে পারত, তবে তারা কি করত জানো—ঘোড়ারা দেবতাদের আঁকত ঘোড়ার মত ক'রে আর ষাঁড়েরা আঁকত ষাঁড়ের মত ক'রে। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান্ জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর—তিনি কখনই বহু হতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে কোনো মরণশীল প্রাণীরই মিল নেই এতটুকুও—না আকারে, না চিন্তায় ভাবনায়। ঈশ্বর অসীম, একক। ঈশ্বর তিনি, যিনি আমাদের সকলের আশ্রয়— যাঁর আরম্ভ নেই, শেষ নেই, সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই, যিনি আপনাতে আপনি পূর্ণ।

বিশ্বভুবনে প্রকৃত সত্য ব'লে যদি আমরা কিছু মেনে নিতে পারি, তবে তা হচ্ছে সেই একমাত্র সত্তা যার পরিবর্তন নেই, বিকার নেই— যে একক, অজাত, অক্ষয়— কাল বা দেশ কিছুই যার সীমা টেনে দিতে পারে না। নূতন ধার্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেনোফেনিস এই সত্তার নাম দিয়েছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু দ্বিতীয় ইলীয়েটিক দার্শনিক **পারমেনাইডিস** এর নাম দিলেন **সৎ** (Being)। মানুষের সামনে দুটি পথ আছে— একটি সত্যের, আরেকটি অসত্যের। সত্যের পথ বেয়ে যদি আমরা যাই তবে এই 'সৎ'কেই পাব। ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ছেয়ে আছে এই সৎ। 'নেই' ব'লে জগতে কিছুই থাকতে পারে না; কারণ যেটা নেই সেটাকে আমরা ভাবতে পারি না। যা নেই, তা কখনো আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু হতে পারে না। যেটাকেই আমরা ভাবি, সেটাই আমাদের ভাবনার কাছে 'আছি' এই কথাটি বলে ব'লেই তাকে আমরা ভাবতে পারি। জগতের

সব বস্তুর এই 'আছি'কে মিলিয়ে বর্তমান পারমেনাইডিসের সৎ। সৎ কালাতীত, চিরন্তন। কালের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু, তারই পরিবর্তন আছে। সে কাল 'ছিল না' আজ 'আছে', কাল আবার 'থাকবে না'। তাই 'চির আছি' এই নিয়েই যার অস্তিত্ব, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। সে চিরদিনই এক, কখনো 'বহু' হয় না, কারণ 'এক'এর বহু হওয়ার মানে তার পরিবর্তন হয় এ কথা স্বীকার করা।

কিন্তু অসত্যের পথ বেয়ে যদি আমরা যাই, তবে দেখতে পাব জগতের ভিতর দিয়ে এই সৎ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুধা প্রকাশকে, নানাবিধ পরিবর্তনকে, যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ওপর বিশ্বাস ক'রে আমরা যাকে সত্য ব'লে মেনে নি।

পারমেনাইডিসের এই মতবাদকে চরম পরিণতিতে এনে হাজির করলেন তাঁর যশস্বী শিষ্য জেনো। জেনো নানারকম ধাঁধাঁর সৃষ্টি ক'রে দেখালেন যে গতি, বহুত্ব, এইসব ধারণাগুলোর সত্যিই কোনো মানেই হয় না! ইলিয়ডের বিখ্যাত আকিলিস— তিনি যদি একটি কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতায় নামেন, আর যদি কচ্ছপটি একটু আগে দৌড়নো আরম্ভ করতে পারে, তবে কিছুতেই তিনি কচ্ছপটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবেন না। তাই যদি হয় তবে আর গতির অর্থ কি! জেনো কারণ দেখিয়ে বললেন যে, যে-স্থানটির ওপর দৌড়নো হবে, সে স্থানটিকে অসংখ্য বিন্দুতে ভাগ করা যায়। এখন, কচ্ছপ একটু আগে দৌড়তে শুরু করেছে ব'লে সে যখন 'খ' বিন্দুতে, য়্যাকিলিস তখন 'ক' বিন্দুতে— সে যখন 'গ বিন্দুতে, য়্যাকিলিস তখন 'খ' বিন্দুতে। এমনি ক'রে য়্যাকিলিস সব সময় এক বিন্দু পেছনেই প'ড়ে থাকবেন। ঠিক এমনি ক'রে জেনো বহুত্বের ধারণাটিরও অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। অনেকগুলো 'এক' (unit) এক জায়গায় জড়ো হলে তবে 'বহুর' (many) সৃষ্টি। এখন, 'এক' যে সে আপনাতে আপনি পূর্ণ, তাকে আর ভাগ করা যায় না, তার মানে তার কোনো পরিধি

(magnitude) নেই। কিন্তু কতগুলো পরিধিহীন 'এক'কে একজায়গায় জড়ো ক'রে তো আর সেই 'বহু'র সৃষ্টি হতে পারে না যার পরিধি থাকতেই হবে।

এই স্থিতিবাদের পাশে পাশেই বেড়ে উঠেছে **হেরাক্লিটাস**-এর গতিবাদ। ইলীয়েটিক দার্শনিকেরা গতিকে অস্বীকার করেছিলেন, কেন না গতি থাকলেই ক্ষয় আসে, আর ক্ষয় মানেই পরিবর্তন। কিন্তু কোনোরকম ক্ষয় বা পরিবর্তন সৎ-এর থাকতে পারে না। হেরাক্লিটাস ঠিক এর বিরুদ্ধ মতটিকে প্রচার ক'রে বললেন, চির-অচল ব'লে কোনো পদার্থই থাকতে পারে না। একটা জিনিসের অন্তের মধ্যে রূপান্তর, এই নিয়েই আমাদের জগৎ। কোনো জিনিস কখনো স্থায়ী হয়ে থাকে না, সে আসে আর চ'লে যায়— এই তো জগতের নিয়ম। মিলেশীয়ান দার্শনিকেরাও পরিবর্তনের কথা, গতির কথা বলেছিলেন। তবে তাঁদের ধারণা ছিল গতি আর আদিম পদার্থ পরস্পর থেকে আলাদা— আদিম পদার্থের গতি আছে। কিন্তু হেরাক্লিটাস দুটোকে এক ক'রে দিলেন। তাঁর মতে গতিই আদিম পদার্থ, আদিম পদার্থই গতি। তাঁর গতিরূপী আদিম পদার্থের নাম দিলেন তিনি **অগ্নি বা তেজ**। অবিরাম চলাই এই অগ্নির স্বরূপ। কিন্তু একটি সোজা সরল পথ বেয়ে চলা এর ধর্ম্ম নয়। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই গতির প্রকাশ—এই সত্যটিকে হেরাক্লিটাস প্রচার করলেন। একটি অধোমুখীন শক্তির টানে অগ্নি পরিবর্তিত হয় জলে, তারপর ক্ষিতিতে; আরেকটি শক্তির আবেগে আবার সে যেতে চায় উর্ধ্বমুখে, তার প্রথম আগ্নেয় অবস্থায়। যে দুটি পথ বেয়ে এই শক্তি দুটি কাজ করে, তিনি তাদের নাম দিলেন অধোমুখী পথ (the downward way) ও উর্ধ্বমুখী (the upward way)। বিভিন্নমুখী এই দুটি পথে চলার সংঘর্ষ থেকেই উদ্ভূত হয় পৃথিবীর যা কিছু আমরা দেখি শুনি স্পর্শ করি—পৃথিবীর জীব জন্তু মানুষ, সকলে। সংঘর্ষকে

তাই হেরাক্লিটাস বলেছেন, 'সকল দ্রব্যের জনক ও নিয়ন্তা'। কিন্তু শুধু যদি এই সংঘর্ষ থাকে, তাহ'লে কি জগতে আমরা কেবল অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশই দেখব না? না। কারণ, বিবর্তমান পৃথিবীর মূলে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা—সংঘর্ষের অন্তরে রয়েছে সংগতির অনুশাসন। পরিবর্তনের ধারা একটি নীতির দ্বারা পরিচালিত। বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষ থেকেই প্রকৃত সংগতির সৃষ্টি হয়, কারণ সে সংঘর্ষ একটি নীতির দ্বারা নিয়মিত। জগতের গতিকে যে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করছে, সেই নীতিকে হেরাক্লিটাস অনেক নামে অভিহিত করেছেন, যেমন নিয়তি (Destiny), ন্যায্যতা বা যৌক্তিকতা (Justice), প্রজ্ঞা (Logos বা Reason)। কয়েকটি জায়গায় তিনি একে ঈশ্বর (God) ব'লেও অভিহিত করেছেন।

এই সংঘর্ষে দার্শনিক মানুষের নৈতিক জীবনেও সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করলেন। মানবজীবনেও এই সংঘর্ষ আছে—ভালোয় মন্দয়, সুরে অসুরে দ্বন্দ্ব আছে—আছে তার রোগ দুঃখ জরা অতৃপ্তি। আর এগুলো আছে ব'লেই এদের উপশমে যে শান্তি সে পায় তা সুন্দর, মহিমাময়।

পারমেনাইডিস যেমন গতিকে বাদ দিলেন, তেমনি স্থিতিকে বাদ দিলেন হেরাক্লিটাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুটোই তো সত্য, এদুটোকে নিয়েই তো জগৎ। তাই এই বিভিন্নমুখী মতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই হ'ল এবার দর্শনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে যে দার্শনিক ব্রতী হলেন তাঁদের নাম **এম্পিডক্লিস,** পরমাণুবাদী **ডিমক্রিটাস ও আনেক্জাগোরাস**। এঁদের সকলেই এ কথা মেনে নিলেন যে আদিম পদার্থের সৃষ্টি বা ধ্বংস কিছুই হতে পারে না; আদিম পদার্থ হবে অনাদি, অবিনশ্বর। কিন্তু জগতে তো আমরা সৃষ্টিও দেখছি, ধ্বংসও দেখছি— এগুলোকে কেমন ক'রে তবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এঁরা বললেন যে আমাদের প্রতিদিনের এই অনুভূত সত্যটিকে সুবোধ্য করতে হ'লে পারমেনাইডিসের 'সৎ'রূপী

আদিম পদার্থকে একক না ভেবে একাধিক ব'লে মেনে নিতে হবে। আদিম পদার্থ বলতে আমরা বুঝব কতকগুলো মূল পদার্থ যাদের সম্মিলনে হয় সৃষ্টি আর বিচ্ছেদে ধ্বংস। সৃষ্টি ও ধ্বংস এই মূল পদার্থগুলির মিলন ও বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মূল পদার্থগুলিও অনাদি, অবিনশ্বর; পারমেনাইডিসের 'সৎ' এর মত 'আছি' এই ঘোষণাটি এরাও চিরন্তন কাল ধ'রে করে। এই পর্যন্ত এই দার্শনিকত্রয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বটে, কিন্তু মূল পদার্থগুলির সংখ্যা এবং স্বরূপের ব্যাপক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল তাঁদের মতদ্বৈধের।

এম্পিডক্লিস-এর মতে এই মূল পদার্থ সংখ্যায় চারটি—**ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ**। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। এদের মধ্যে গুণগত বৈষম্য এত তীব্র যে একটি মূল পদার্থ অন্য কোনো একটি মূল পদার্থের মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারে না।—পারে শুধু একটি স্থানে দেহগত মিলনে সম্মিলিত হতে। এমনি ক'রে একত্র হয়ে এরা সৃষ্টি করে যাবতীয় বস্তু; শুধু তাই নয়, মানুষও তৈরি হয় এদের নিয়েই। আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরাই আনে দ্রব্যাদির ধ্বংস। কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন ওঠে। এই পদার্থগুলির নিজেদের মধ্যে কি এমন কোনো গতিশক্তি আছে যার বলে এরা নিজেরাই এমনি ক'রে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে? না, তেমন কোনো নিজস্ব শক্তি এদের নেই। এম্পিডক্লিস **প্রেম ও ঘৃণা** বলে দুটি বহিঃশক্তির কল্পনা করলেন যাদের প্রভাবে এরা গতি পায়, সম্মিলিত হতে চায়। প্রেম ও ঘৃণা বললেই আমাদের মনে যে মানবিক প্রবৃত্তির কথা উদিত হয়, এম্পিডক্লিস কিন্তু ঠিক তাদের নির্দেশ করেন নি। যদিও মানবিক প্রবৃত্তি দুটির কথা ভেবেই হয়তো তিনি তাঁর বহিঃশক্তি দুটির পরিকল্পনা করেছিলেন, তবুও যে অর্থে তিনি তাদের ব্যবহার করেছেন, সে অর্থ আর কিছুই নয়, শুধু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। প্রেম হচ্ছে আকর্ষণী শক্তি, মিলনের কারণ; ঘৃণার মধ্যে মূর্ত হয় বিকর্ষণী

শক্তি, বিচ্ছেদের কারণ। এই দুটি শক্তি চিরন্তন, ঠিক যেমন মূলপদার্থগুলো চিরন্তন; আর এই শক্তিদুটির বিরোধ—তাও চিরন্তন। যখন প্রেমের প্রভাব থাকে অপরাজেয়, তখন সমস্ত পদার্থগুলো সম্মিলিত হয়ে জাগিয়ে তোলে সুন্দর সৃষ্টির এক সংহতিময় সুর। কিন্তু ঘৃণা যখন দুর্জয় হয়ে উঠে, তখন আসে দ্বন্দ্ব বিরোধ সংগ্রাম, আসে বিচ্ছেদ—তখন পদার্থগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় আর জীবনের ঢেউগুলো তাদের তাল-লয়-মীড় হারিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে বেসুরে। এমনি ক'রে চক্রাকারে অনন্ত কাল ধ'রে চলে প্রেম ও ঘৃণার, গড়া আর ভাঙার খেলা। পৃথিবীর ইতিহাস, সে তো শুধু এই ভাঙা-গড়ারই ইতিবৃত্ত।

গতিবাদ ও স্থিতিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে পরমাণুবাদীরা যে মতবাদ সৃষ্টি করলেন, তা কিন্তু এম্পিডক্লিসের বিরোধী রূপ নিয়েই গ'ড়ে উঠল। এই পরমাণুবাদীদের অগ্রণী **ল্যুসিপাস** ও **ডিমক্রিটাস**। যদিও ল্যুসিপাসই পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছুই জানি না যেমন জানি ডিমক্রিটাসের সম্বন্ধে। ডিমক্রিটাসের লেখার মধ্য দিয়ে পরমাণুবাদ পেয়েছে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান পেয়েছে তার ভিত্তি ও প্রথম প্রেরণা।

শূন্য স্থান বা দেশ ব'লে ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই থাকতে পারে না, কারণ জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই ছেয়ে আছে 'চির-আছি' সৎ, ইলীয়েটিক মতবাদের এই হ'ল মূল সুর। কিন্তু শূন্য স্থান না থাকলে কোনোরকম গতি, কোনোরকম চলাচল, কোনোরকম পরিবর্তন কখনো সম্ভব হতে পারে না। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সৃষ্টিও অসম্ভব। তাই, সৎ যে দেশ ভ'রে বিরাজ করে তারই পাশে শূন্য স্থানের অস্তিত্বের কথা পরমাণুবাদীরা স্বীকার করলেন, আর করলেন পারমেনাইডিসের একক অসঙ্গ সৎকে ভেঙে চুরে বহু চিরস্থায়ী পরমাণুতে পরিণত। এম্পিডক্লিস এই

সংকেই ভেঙে পেয়েছিলেন মাত্র চারটি মূল পদার্থ। কিন্তু পরমাণুবাদীরা দেখলেন যে এই মূল পদার্থগুলোকে আরও ভাঙা যায়, তাই এরা যথার্থ মূল পদার্থ বলে পরিগণিত হতে পারে না। এদের ভাঙতে ভাঙতে যে চরম সূক্ষ্ম পদার্থে পৌঁছনো যায়, সেই পদার্থগুলোই হ'ল **পরমাণু** (atoms)। পরমাণুরাই প্রকৃত আদিম পদার্থ; এম্পিডক্লিসের তথাকথিত মূল পদার্থ এদের নিয়েই তৈরি। সংখ্যায় পরমাণুরা অগণিত। এই অসংখ্য পরমাণুর দল— এদের প্রত্যেকেই পারমেনাই-ডিসের সৎ-এর মত— অনাদি, অবিনশ্বর, অবিকারী, আপনাতেই পরিপূর্ণ। এরা এত ক্ষুদ্র, এত সূক্ষ্ম যে এদের আর ভাঙা যায় না, এদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সূক্ষ্মতর কিছু কল্পনা করা যায় না। পরমাণুবাদীর সঙ্গে এম্পিডক্লিসের মতদ্বৈধের এই হল শুরু। কিন্তু এই মতদ্বৈধ প্রকাশ পেল আরও তীব্র হয়ে আরেকটি বিষয়ে। এম্পিডক্লিসের বিরুদ্ধে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে এই পরমাণুদের মধ্যে কোনো গুণগত বৈষম্য নেই—গুণের দিক দিয়ে সকলেই সমজাতিক। আছে শুধু পরিমাণগত অনৈক্য—একটির সঙ্গে অন্য একটির প্রভেদ শুধু আকারে, আয়তনে, ওজনে। যে আদিম উপকরণগুলো থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরমাণুর মধ্যে কোনো গুণগত বৈষম্য নেই বলেই পৃথিবীতেও কোনো গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যে দেখি, একটি জিনিস আরেকটি জিনিস হতে ভিন্ন হয় শুধু পরিমাণের জন্য নয়, গুণের জন্যও? সে দেখা ভুল—তার জন্য দায়ী আমাদের ইন্দ্রিয়। প্রত্যেকটি জিনিসের দুটি করে গুণ আছে—একটি তার নিজস্ব, সেটা পরিমাণগত; আরেকটি তার উপর আরোপ করে আমাদের ইন্দ্রিয়, সেটাকে আমরা মানুষেরা বলি বস্তুর গুণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা আরোপিত গুণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি জিনিসকে সাদা দেখি, আরেকটি দেখি কালো—একটিকে পরশ করলে পাই উষ্ণতা, আরেকটি লাগে শীতল। এই হচ্ছে গুণগত বৈষম্য, আর এই বৈষম্যের অনুভূতি আমরা পাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত—

এ শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের রাজ্যেই সত্য, প্রাকৃতিক জগতে ঐরকম কোনো সাদা-কালো শীতল-উষ্ণের প্রভেদ নেই। কোনো বস্তুই প্রকৃতপক্ষে সাদা বা কালো নয়, শীতল বা উষ্ণ নয়। পরমাণুবাদীর বস্তুর নিজস্ব গুণ ও আরোপিত গুণের মধ্যে এই ভেদাভেদ সৃষ্টি করে জন্ম দিলেন পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি তুমুল তর্কসাপেক্ষ সত্যকে। সেটা হচ্ছে বস্তুর নিজস্ব গুণ (primary qualities) ও আরোপিত গুণের (secondary qualities) পার্থক্য।

এই সামাজিক পরমাণুগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে শূন্য স্থান; আর এমনি ক'রে রেখেছে ব'লেই এরা সম্মিলিত হতে চায়, যে সম্মিলন থেকে সৃষ্টি হয় পৃথিবীর। যে শক্তির প্রভাবে তারা সম্মিলিত হয়, হতে চায়—সে শক্তি প্রেমের মত কোনো বহিঃশক্তি নয়। সে শক্তি তাদেরি মধ্যে আছে। এক অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার প্রভাবে এরা একের প্রতি অপরে ছুটে যায়, একের সঙ্গে অপরে মিলিত হয়, ধীরে ধীরে গ'ড়ে তোলে জীবজন্তু গাছপালা নদীমাটির জগৎ। শুধু এই অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার আবেগেই এরা সৃষ্টি করে—কোথায় উদ্দেশ্য তাদের সম্মুখে নেই, সেই কোনো অদৃশ্য কর্মপন্থার পরিপূরণের নির্দেশ। নিজের আবেগে সৃষ্টিকার্য ক'রে চলে ব'লে সৃষ্টি কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর নয়। পরমাণুদের অনুপ্রেরণার প্রকাশ, তা যে নিয়মশৃঙ্খলার অনুশাসন মেনে চলে—মেনে চলে 'ওটা-হয়েছে-ব'লে-এটা-হল'র নির্দেশ।

আনেক্জাগোরাস গতিবাদ ও স্থিতিবাদকে মিলিয়ে যে তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন, তার সঙ্গে এম্পিডক্লিস ও পরমাণুবাদীর মতবাদের বৈষম্য দেখা দিল অনেক দিক দিয়ে। একথা সত্যি যে কতগুলো আদিম উপাদানের সংমিশ্রণ ও বিচ্ছেদের থেকে জগতের উদ্ভব ও বিলয় হয়। কিন্তু সে উপাদান সংখ্যায় তো মোটে চারটি

হতে পারে না। বৈচিত্র্যময় জগৎ—তার এই বিচিত্রতা সৃষ্টি করতে পারে যে উপাদান, তাও হবে গুণে বিচিত্র ও সংখ্যায় বহু। অ্যানেক্সাগোরাস এই উপাদান-গুলোর নাম দিলেন বস্তুর **বীজ** বা **মূল** (seeds বা roots)। সব জিনিসেরই এক একটি নিজস্ব বীজ আছে—এক একটি নির্দিষ্ট বীজ থেকে এক একটি নির্দিষ্ট জিনিস উৎপন্ন হয়; যেমন বলা যেতে পারে, স্বর্ণবীজ থেকে সোনা, অস্থিবীজ থেকে অস্থি, প্রস্তরবীজ থেকে প্রস্তর, এমনি আরো কত কি! জগতে যত জিনিস আছে, বীজ আছে ঠিক তত। এই বীজ অতি সূক্ষ্ম, এবং সমস্ত দেশ ছেয়ে এরা বিভ্যমান। তাই কোনো একটি বীজ থেকে যখন কোনো একটি জিনিস সৃষ্ট হয়, তখন সে জিনিসটির মধ্যে অন্যান্য সব বীজেরই কিছু-না-কিছু অংশ থেকে যায়। কিন্তু তা ব'লে এ-কথা বলা চলবে না যে, জগতের জিনিসগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য, বিশেষ ক'রে গুণগত পার্থক্য, নেই। এম্পিডক্লিসের যে মতটিকে পরমাণুবাদীরা অস্বীকার করেছিলেন, অ্যানেক্সাগোরাস সেইটের উপর বেশী ক'রে জোর দিয়ে বললেন যে, গুণগত বৈষম্য শুধু যে আছে তা নয়, এই বৈষম্যই বীজদের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। গুণের দিক থেকে একটি জিনিস আরেকটি জিনিস হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এবং এমনি ক'রে পৃথক হয় শুধু কেবল সৃষ্টির আদিম উপকরণ যে বীজ তাদের মধ্যে ঠিক এমনি গুণগত পার্থক্য রয়েছে বলেই। যদিও সমস্ত বীজ কিছু না কিছু পরিমাণে একটি নির্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে আছে, তবু এই নির্দিষ্ট জিনিসটির মধ্যে যে বীজটির অংশ সব চেয়ে বেশী, তারই গুণানুযায়ী তৈরি হয় জিনিসটির গুণ। যেমন, অগ্নি উষ্ণ কেননা তার মধ্যে আছে তাপবীজের আধিক্য। প্রত্যেকটি বীজের গুণ ভিন্ন বলে তাকে নিয়ে সৃষ্টজিনিসটির গুণও অন্যান্য জিনিস থেকে ভিন্ন হয়।

আরেকটা দিক দিয়েও পরমাণুবাদীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটল। এই মূল বীজগুলোর সংমিশ্রণ থেকেই দ্রব্যাদির সৃষ্টি হয়, সন্দেহ নেই; কিন্তু এরা যে সংমিশ্রিত হয় তার জন্য এদের নিজস্ব কোনো গতিশক্তি দায়ী নয়। একটি

বহিঃশক্তিই এদের গতি দেয়, যার ফলে এরা একত্র হতে পারে। তবে, সে বহিঃশক্তি সংখ্যায় একটি—দুটি নয়। তিনি এই শক্তির নাম দিলেন **মন** (Nous বা Mind)। মূল বীজ—সংখ্যায় তারা অগণিত—নিশ্চল হয়ে প'ড়ে আছে পুঞ্জীভূত অবস্থায়। মন এসে তাদের নাড়া দেয়, আর দেয় সৃষ্টির পরিকল্পনা। সে-পরিকল্পনা অনুযায়ী আরম্ভ হয় আমাদের প্রতিদিনকার চেনাশোনা পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য। এই পৃথিবীর নানা বিচিত্রতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই অপরূপ শিল্পকলা-কৌশলের প্রকাশ, কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার অভিব্যক্তি। কিন্তু এ সব কি কখনো সম্ভব হত যদি সৃষ্টির আদিম উপকরণগুলো, যারা প্রকৃতপক্ষে জড় ও অচেতন, তাদেরই মধ্যে থাকত সৃজনের স্বাভাবিক শক্তি ও বুদ্ধি? শিল্পকলা-নিয়মশৃঙ্খলার রচনা—মন ছাড়া কে আর তা করতে পারে! তাই এই সুন্দর বিচিত্র নিয়মানুগত জগতের মূলে রয়েছে এক বিরাট মানসশক্তির প্রেরণা। অ্যানেক্জাগোরাসের এই মানসশক্তির স্বরূপ কি, তা নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে, কারণ তিনি নিজেই এই পরিকল্পনার কোনো পরিষ্কার ধারণা দিয়ে যান নি। তবে তাঁর বর্ণনা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে এই মানসশক্তির আধার যে মন সে সমস্ত বীজ হয়ত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন—জড় পদার্থের সঙ্গে তার সংশ্লেষ বা সাদৃশ্য নেই এতটুকুও—সে বিরাজ করে আপনার একক, অসঙ্গ মহিমায়। যদিও মন বলতে পরবর্তী যুগে যে বিদেহী চিদাত্মক সত্তা বোঝাত, তাঁর বর্ণনায় আমরা ঠিক সে সত্তার নির্দেশ পাই না। তবুও তিনি যে তেমনিই একটি সত্তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণ হতেই প্রতীয়মান হয়। এই মন-এর ধারণার ভিতর দিয়ে তিনি গ্রীকদর্শনকে এক নতুন পথে চলবার প্রেরণা দিলেন। জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হ'ল তাঁর এই মন-এর পরিকল্পনায়, তা পরবর্তী যুগের দর্শনে এক যুগান্তকারী বিপ্লবকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করল অনেক পরিমাণে।

দ্বিতীয় যুগ

মানুষের কথা

নতুন ক'রে ভাঙাগড়ার যুগ হল শুরু। দর্শন যেন নেমে এল স্বর্গ থেকে মানুষের দুয়ারে। মানুষের কথা নিয়ে মেতে উঠল এই বিপ্লবের যুগ। এতদিন দার্শনিকেরা মানত জগতের প্রাধান্য, এ-কথা মানত যে কি থেকে জগৎ তৈরি হয়েছে এ জানা যদি শেষ হয়, যদি পরিপূর্ণ হয়, তবে মানুষের সম্বন্ধে জানাও হবে শেষ, হবে পরিপূর্ণ। কারণ, মানুষ তো আর জগৎ-ছাড়া নয়—জগতের নানাবিধ জিনিসের মধ্যে সেও যে একটি। কিন্তু এই নূতন যুগ কঠিন কণ্ঠে সে-কথা অস্বীকার করল। জগতের সম্বন্ধে জানা? সে চেষ্টা যে অর্থহীন, এইটেই শুধু প্রমাণিত হয় সে চেষ্টার ফলাফল দেখে। জগতের সম্বন্ধে যত দার্শনিক যত মতবাদ প্রচার করেছেন, তাদের মধ্যে মিল নেই কোথাও, আছে শুধু বিরোধ। জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা কি তবে নিরর্থক, নিষ্ফল নয়! তা ছাড়া, দার্শনিকেরা এ-কথা বললেন যে, ইন্দ্রিয় দিয়ে যে-জগৎকে আমরা পাই, জানি, সে-জগৎটার চেয়ে সত্য আমাদের চিন্তা বিচার বুদ্ধিতে পাওয়া জগৎ। কিন্তু এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করবে কে? ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচারবুদ্ধিতে পাওয়া জ্ঞানেও কি সেই বিভিন্নতা নেই? এই প্রশ্নই বোধ হয় নূতন যুগের মানুষের মনকে ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিতে লাগল। তাই একদল দার্শনিক এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ নিয়ে এতদিন ধরে গ'ড়েতোলা দার্শনিক চিন্তার প্রাসাদটির মূলে ঘা দিয়ে ঘোষণা করলেন, জগতের সবকিছু জিনিসের মানদণ্ড মানুষ। মানুষ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করবে সব কিছুর মূল্য, বিচার করবে নানা মতের সত্যতা অসত্যতা। এই দার্শনিকদের **সোফিস্ট** (Sophist) বলা হত। **প্রোটাগোরাস,**

জর্জিয়াস, প্রডিকাস এঁরাই সোফিস্টদের অগ্রণী। সোফিস্টরা ছিলেন ভ্রাম্যমান শিক্ষক। বেশ মোটারকমের পারিশ্রমিক নিয়ে সমাজে ও ব্যবহারিক জীবনে যশ প্রতিপত্তি কর্মকুশলতা, এগুলো লাভ করবার জন্য লোকের যে শিক্ষা দরকার, শিক্ষার্থীকে তা দেওয়াই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ব্যবহারিক জীবনটাই সোফিষ্টদের কাছে সব। সাধারণ দৈনন্দিন অস্তিত্বের চেয়ে বেশী কিছু, বড় কিছু, আছে—প্রতিদিনের জীবনে শুধু যশপ্রতিপত্তি লাভ করার চেয়েও যে উন্নততর উদ্দেশ্য, মহত্তর সত্য রয়েছে, তা তাঁরা মানলেন না। তাই মানুষ তাঁদের কাছে চরম সত্য হয়ে দাঁড়াল এবং এই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিবিধান করাই তাঁরা একমাত্র করণীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু মানুষের মধ্যেও তো দুটি মানুষ আছে—একটি বিশ্বজনীন মানুষ, আরেকটি ব্যক্তিগত মানুষ। বিশ্বজনীন মানুষটির মাঝে পাওয়া যায় এক বিরাট ঐক্য—সমস্ত মানুষ এখানে যেন এক মহামানবের মাঝে লীন হয়ে যায় আদর্শে ও উদ্দেশ্যে। আর ব্যক্তিগত মানুষটির মধ্যেই বাসা বাঁধে যত বিরোধ, যত বিভিন্নতা, মানুষে মানুষে যত ভেদাভেদ। বিশ্বজনীন মানুষটি তৈরি হয় প্রজ্ঞা দিয়ে। ব্যক্তিগত মানুষটির প্রধান উপজীব্য ইন্দ্রিয় আর এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায় যে জ্ঞান, যে সুখ, যে সম্ভোগ। সোফিস্টরা বিশ্বজনীন মানুষটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেন, কেননা মানুষের ভেদাভেদটাই তাঁদের চোখের সম্মুখে বেশী করে প্রতিভাত হয়েছিল। আর এই ইন্দ্রিয়-নিবদ্ধ মানুষটিই যে একমাত্র সত্য, শুধু তাই নয়—এই মানুষটির কাছে যা সত্য বলে প্রতীত হবে তাই শুধু সত্য—যা সুন্দর বলে গৃহীত হবে তাই কেবল সুন্দর—যা ন্যায়সংগত বলে প্রমাণিত হবে তাই শুধু ন্যায্য। সত্য শিব সুন্দর—এদের কোনো সর্বজনীন বাস্তব সত্তা বা সভ্যতা নেই। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না-লাগার মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় এদের সারবত্তা। জগৎ হতে দর্শনের দৃষ্টিকে সরিয়ে এনে মানুষের ওপর ফেলে সোফিস্টরা মানুষের সম্বন্ধে আলোচনার অনুপেক্ষণীয় প্রয়োজনীয়তার কথায় দর্শনকে পূর্ণরূপে

সচেতন করলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিকে তাঁরা এত সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন যে মানুষের সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ণতা পেল না। ব্যক্তিগত মানুষটিকেই মানুষের সর্বস্ব বলে প্রচার করার ফলে মানুষ সোফিস্টদের হাতে হয়ে পড়ল পঙ্গু, অসম্পূর্ণ।

মানুষকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষণায় দেখে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলবার ভার যিনি নিলেন তিনি চিরস্মরণীয় মহাজনদের অন্যতম, **সক্রেটিস**। জগতের আদিম উপাদান খোঁজার যে কোনো সার্থকতা নেই এবং মানবজীবনের শ্রেয়কে আবিষ্কার করাই যে দর্শনের প্রধান কর্তব্য, এ-কথা সোফিস্টদের মত তিনিও মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে, শ্রেয়কে আবিষ্কার করতে হ'লে মানুষকে তার বিশ্বজনীন রূপে দেখতে ও বিচার করতে হবে। যে ব্যক্তিগত রূপটিকে সোফিস্টরা মানুষের সত্য রূপ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন তার চেয়েও সত্য যে মানুষের বিশ্বজনীন রূপটি। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বজনীন রূপটি আছে ব'লেই মানুষের ব্যক্তিগত রূপটির অর্থ আমরা খুঁজে পাই। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিই ব্যক্তিগত মানুষের সর্বস্ব। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্য যে দিয়ে অনুভূতি আমরা পাই, সেটা কিসের অনুভূতি তা কি আমরা কখনো জানতে পারতাম যদি না সেই অনুভূতিকে প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্লেষণ করে বুঝতাম। যখনই আমার ইন্দ্রিয় কোনো একটা জিনিসের সংস্পর্শে আসে তখনই আমার সেই জিনিসটির সম্বন্ধে একটা অনুভূতি হয়। কিন্তু এই অনুভূতি কেবল নিছক একটা বোবা অনুভূতি মাত্র— কারণ এই প্রথম অনুভূতি জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। এই নিছক অনুভূতি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার কাজ সুরু হয়। প্রজ্ঞার মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের এক একটি সামান্যপ্রত্যয় (concept) আছে। অনুভূতিকে পেয়েই প্রজ্ঞা দেখে কোন্ সামান্যপ্রত্যয়ের সঙ্গে তার মিল আছে।

যেমন, কোনো একটা বস্তুর অনুভূতির সঙ্গে প্রজ্ঞা দেখল যে গাছের সম্বন্ধে তার যে সামান্য প্রত্যয় আছে, সেই সামান্যপ্রত্যয়ের সঙ্গে বস্তুর অনুভূতিটির মিল আছে। তখন সে যেন রায় দেয় অনুভূতিটি গাছের, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলি, 'একটি গাছ দেখছি'। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় যে অনুভূতি তার কোনো অর্থই ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রজ্ঞা তার অন্তরে সঞ্চিত সামান্যপ্রত্যয়গুলি দিয়ে বিচার করে এই অনুভূতিটি কোন্ সামান্য প্রত্যয়ের অন্তর্গত। এই সামান্য প্রত্যয় কাকে বলে? একটা উদাহরণ নিয়েই আরম্ভ করা যাক। ঘোড়া আমরা সকলেই দেখেছি, এও দেখেছি ঘোড়া নানা রঙের, নানা জাতের। কিন্তু এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে সব ঘোড়াই এক। ঘোড়া সাদা হোক বা কালো হোক, আরবী হোক বা পশ্চিমা হোক—সব ঘোড়াই মেরুদণ্ডী, চতুষ্পদী, উদ্ভিজ্জভোজী। এই যেসব গুণগুলো জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ঘোড়ার মধ্যে আছে, সেই গুণগুলো দিয়ে তৈরী হয় ঘোড়ার প্রকৃত রূপ, আর এই প্রকৃত রূপ নিয়েই গ'ড়ে ওঠে ঘোড়ার সামান্যপ্রত্যয়। যে রূপটি কোনো একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যেই অপরিবর্তিত হয়ে বিরাজ করে সেইটেই সেই প্রাণীর বা বস্তুর শ্রেণীর প্রকৃত রূপ। এই রূপটি কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকলের পক্ষেই সমানভাবে সত্য ব'লে এই রূপটি সেই শ্রেণীর সর্বজনীন রূপ। এই সর্বজনীন রূপটি না থাকলে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রাণী তার নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারত না। যেমন, কোনো প্রাণী যদি মেরুদণ্ডী, চতুষ্পদী, উদ্ভিজ্জভোজী না হয়, তবে সে আরবীই হোক বা পশ্চিমাই হোক, সাদাই হোক বা কালোই হোক, তাকে আমরা কখনো ঘোড়া বলব না। ঘোড়া কি—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সর্বজনীন রূপটিকে ব্যক্ত ক'রেই বলি, ঘোড়া একটি মেরুদণ্ডী, উদ্ভিজ্জভোজী, চতুষ্পদী জন্তু, এ কথা বলি না যে ঘোড়া একটি কালো আরবী জন্তু বা সাদা পশ্চিমা জন্তু। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, কোনো

কিছুর সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে তার সর্বজনীন রূপটিকেই আগে জানতে হবে; আর সামান্যপ্রত্যয়ের মধ্যেই রূপায়িত এবং পরিপূর্ণ হয় সেই জ্ঞান। কোনো কিছুর সামান্যপ্রত্যয়কে জানা মানেই তার সর্বজনীন রূপটিকে জানা। আর তা জানতে পারলেই তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও হবে পরিপূর্ণ।

তাই সক্রেটিসের কাজ হল আমাদের সামাজিক, রাজনীতিক, নৈতিক, দার্শনিক ইত্যাদি জীবনে যে-সকল ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলির সামান্য প্রত্যয় কি তাই জানা, কারণ এমনি করেই সেগুলির সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারব। এই সামান্যপ্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা শুরু করে সক্রেটিস সোফিষ্টদের হাতে ঘা-খাওয়া মানুষের প্রজ্ঞার দাবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান পাই সে জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করে আমরা যে কেবল আমাদের জানবার আকাঙ্ক্ষাটিকেই পূর্ণ করি তা নয়, এরই মধ্য দিয়ে অর্জন করি শ্রেষ্ঠ পুণ্য। জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is Virtue)—এইটেই সক্রেটিসের মূলমন্ত্র। পুণ্য কাজ কি, তা না জেনে আমরা যেমন কোনো প্রকৃত পুণ্য কাজ করতে পারি না, তেমনি যদি একবার পরিপূর্ণরূপে জানতে পারি পুণ্য কাজ কি, তবে আর কোনো অন্যায় বা পাপ কাজ আমরা কখনো করতে পারি না। এমনি করে সক্রেটিস শুধু জ্ঞান এবং পুণ্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধই দেখালেন না, জ্ঞান এবং পুণ্যকে এক করে দিলেন। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের ভালো চায়। যদি সে জানতে পারে কোন্ কাজের দ্বারা সে তার ভালো করতে পারবে, যদি সে বুঝতে পারে পুণ্য কাজের মধ্য দিয়েই আসবে তার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তবে কেন সে পাপ বা অন্যায় কাজ করতে যাবে? অজ্ঞানে দৃষ্টি তার যতক্ষণ ঢাকা থাকে, ততক্ষণই সে পাপের পথে চলে, অন্যায়কে কল্যাণকর বলে মনে করে। কোনো লোকই তাই ইচ্ছে করে সজ্ঞানে পাপী হয় না, পাপী হয় শুধু কিসে তার যথার্থ কল্যাণ সে জ্ঞান নেই বলে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ভালো কি? মানুষ তার ভালো চায়

সন্দেহ নেই, কিন্তু কিসে তার ভালো হয়—কি তার পক্ষে সব চেয়ে বেশী কল্যাণকর? সোফিস্টরা বলেছেন ব্যবহারিক জীবনে উৎকর্ষলাভের মধ্যেই তার চরম কল্যাণ। কিন্তু সক্রেটিস এই ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষের চেয়ে মানসিক উৎকর্ষকেই উঁচু আসন দিলেন। এই মানসিক উৎকর্ষলাভের জন্য মানুষকে তার চাওয়া-পাওয়াকে তার ব্যক্তিগত সুখের কামনা-বাসনাগুলিকে কমিয়ে আনতে হবে; তার পরিবর্তে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে মানুষের প্রতি স্নেহ প্রেম দয়া মায়া ভালোবাসা। ব্যক্তিগত জীবনটিকে এই বিশ্বজনীন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সবচেয়ে বড় শ্রেয়, বড় কল্যাণ। কিন্তু আমরা তো দেখি ব্যক্তিগত সুখের কামনায় মানুষ তার এই কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরে যেতে চায়। চায় বটে, কিন্তু তার জন্য দায়ী তার অজ্ঞতা, তার নিজের প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপটির সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মানুষ যখনই এ রূপটিকে জানবে বুঝবে চিনবে, তখনই সে তার নিছক ব্যক্তিগত কামনাকে জয় করতে চেষ্টা করবে—সে-চেষ্টা না করে সে তখন পারবে না, কারণ মানুষ যে তার শ্রেষ্ঠ ভালোকে, শ্রেষ্ঠ কল্যাণকেই চায়। এই বিশ্বজনীন রূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তারই মধ্য দিয়ে হয় পরিপূর্ণ কল্যাণের আবির্ভাব—আর সেই আবির্ভাবই বয়ে আনে চির-অভীপ্সিত আনন্দ। সক্রেটিসের মতবাদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কল্যাণ এবং আনন্দ যে এক, এ-কথা তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

সক্রেটিসের অনুচরেরা পুণ্য কি, কল্যাণ কি, এই প্রশ্নকে আরো বিচার বিশ্লেষণ করে তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চাইলেন। একই প্রশ্ন নিয়েই যদিও তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ হল, তবুও তাঁরা যে উত্তর পেলেন তা বিভিন্ন ধরনের। এই উত্তরের প্রকৃতি-অনুযায়ী আমরা সক্রেটিসের অনুচরদের তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করতে পারি: **সিনিক** (Cynic), **সিরেনাইক** (Cyrenaic), **মেগারিক** (Megaric)।

আন্টিসথেনিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিনিক সম্প্রদায়ের মতে নিজস্ব সুখসুবিধার আকাঙ্ক্ষা, ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভের মোহ—এগুলোকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে কঠিন বৈরাগ্যের পথ ধরে চলতে হবে। পুণ্য বলতে সিনিক-সম্প্রদায় এই কঠিন বৈরাগ্যই বুঝলেন। সক্রেটিস কিন্তু এমন কঠিন বৈরাগ্যের কথা প্রচার করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনের কামনাবাসনাগুলিকে তিনি শুধু কমিয়ে আনতে বলেছিলেন—তাদের চাহিদাকে মেটাবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের বিশ্বজনীন রূপকে যেন ব্যাহত অর্থহীন করে না দেয়, এই ছিল তাঁর অনুশাসন।

আরিসটিপাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিরেনাইক সম্প্রদায় সিনিকদের বিরুদ্ধ মতটিকে ঘোষণা ক'রে বললেন যে সুখসম্ভোগের মাঝেই পুণ্য রয়েছে। একথা সক্রেটিস বলেছেন, পুণ্যের মধ্য দিয়েই মানুষ পাবে তার আনন্দ। এই আনন্দ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ব'লেই মানুষ পুণ্যের পথে চলতে চায়। তাই পুণ্যকে চাওয়া মানেই আনন্দকে চাওয়া। সিরেনাইকরা এই আনন্দকে পাওয়াই জীবনের চরম কাম্য ব'লে মেনে নিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের আনন্দের ধারণার সঙ্গে সক্রেটিসের ধারণার সদৃশ্য রইল না। সুখসম্ভোগই তাঁদের কাছে প্রকৃত আনন্দ। কিন্তু সুখসম্ভোগ ও আনন্দের মাঝে প্রভেদ যে অনেক! ইন্দ্রিয়ের কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি থেকে জন্ম নেয় সুখসম্ভোগ, আর আনন্দের আবির্ভাব হয় মানুষের বিশ্বজনীন আশা আকাঙ্ক্ষার সন্তোষের মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে যে সুখ উদ্ভূত হয়, সেই সুখই মানুষের কাম্য এ-কথা বললেও সিরেনাইকরা এই সুখসম্ভোগলাভে বিচারবুদ্ধি খাটাবার কথা বলেছেন—বিচারবুদ্ধির বন্ধন অস্বীকার ক'রে যে সুখলাভ করা যায় তার পরিণতি দুঃখ বেদনা অশান্তি।

মেগারার অধিবাসী **ইউক্লিড** কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেগারিক সম্প্রদায় পারমেনাইডিস ও সক্রেটিসের মতবাদকে মিলিয়ে একটি মত গড়ে তুললেন।

জ্ঞানই পুণ্য, আর এই জ্ঞান কল্যাণের জ্ঞান—এ-কথা সক্রেটিস বলেছেন। কল্যাণ চিরন্তন, স্বপ্রতিষ্ঠ, চিরসত্য—তার কোনো পরিবর্তন নেই। তাই কল্যাণের সঙ্গে সৎ-এরও কোনো পার্থক্য নেই। সৎ এবং কল্যাণ এক। কল্যাণ জ্ঞানের বিষয় একথা বলাও যা, সৎ জ্ঞানের বিষয় এ-কথা বলাও তাই। সুতরাং মেগারিকদের মতে, নির্বিকার চিত্তে এই তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সব চেয়ে বড় পুণ্য।

নূতন যুগ

সমন্বয়ের চেষ্টা

শুরু হল সমন্বয়ের যুগ। গ্রীক দর্শনের আরম্ভে প্রাকৃতিক জগতের কথাই ছিল প্রধান। তারপর মানুষের কথা লাভ করল প্রাধান্য। এইবার প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানুষকে মিলিয়ে যে সত্য বিরাজ করে, যে সত্যের অভিব্যক্তি শুধু মানুষ নয়, আমাদের প্রতি দিনকার পৃথিবীও, সেই পরম সত্যের স্বরূপকে আবিষ্কার করাই দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এ কাজের ভার যাঁরা নিলেন, মানুষের ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয়। তাঁদের নাম **প্লেটো** এবং **আরিস্টটল**।

প্লেটো তাঁর জীবনের চারটি সৌভাগ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন— তিনি মানুষ হয়ে জন্মেছেন; শুধু তাই নয়, তিনি গ্রীক হয়ে জন্মেছেন; গ্রীসের মধ্যে সেরা যে দেশ সেই এথেনসে তার জন্ম; আর সেই এথেনসের যে সেরা লোক সেই সক্রেটিসের সময়েই তিনি জন্মেছেন। শেষের সৌভাগ্যই প্লেটোর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। তিনি জগৎকে যে নূতন ভাবধারা দিয়ে গেলেন তার মূলে রয়েছে সক্রেটিসের শিক্ষা ও প্রেরণা।

যেদিন থেকে দর্শন মানুষের কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল, সেদিন থেকে তাকে নিছক ভাবরাজ্য থেকে নেমে আসতে হল—মানুষের জীবনকে কেমন ক'রে সে পরিচালিত করবে, কেমন ক'রে তার চিরাশ্রয়ের সন্ধান দিয়ে মানুষকে সেদিকে অনুপ্রাণিত করবে, এই তার প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। প্লেটোও এই আদর্শে দীক্ষিত হলেন। জ্ঞানের অনুসন্ধান—যে জ্ঞান মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে তার মনকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলবে—সেই প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধানই হল দর্শনের চরম ও পরম কর্তব্য। কিন্তু, কি সেই জ্ঞান?

কি তার স্বরূপ? কি তার বিষয়বস্তু? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় প্লেটোর মতবাদের মূল সুর।

মানুষের জ্ঞান দুরকমের। সাধারণ লোকে যা জানে, তাকে প্লেটো বলেছেন লৌকিক ধারণা (opinion)। সাধারণ লোকের যে জ্ঞান তা কখনই ধ্রুব, অপরিবর্তিত, সর্বজনীন জ্ঞান নয়। কোনো একটা জিনিসের সম্বন্ধে আজ সে যা জানল, কাল হয়তো তা মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে। সে যা সত্যি বলে জানল, আরেকজন হয়তো সেটাকে মিথ্যে বলে মানল। কিন্তু আমাদের আরেক রকম জ্ঞান আছে যা ধ্রুব, যা চিরকাল সত্য, যা চিরদিন সকলের কাছে সমানভাবে সত্য। এই জ্ঞান অর্জন করতে চায় দার্শনিক। কিন্তু এমনি চিরসত্যরূপে জানব কাকে? জগতে আমরা নিরন্তর পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি—হেরাক্লিটাস একথা ঠিকই ধরেছিলেন, বুঝেছিলেন যে একটা জিনিসের অন্যের মধ্যে রূপান্তর, এই নিয়েই আমাদের জগৎ। এই পরিবর্তনশীল জগৎ তো চিরসত্য ধ্রুব জ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। প্লেটো এই সমস্যার মীমাংসা করলেন তাঁর বিখ্যাত **প্রত্যয়বাদ** (The Theory of Ideas) দিয়ে। সক্রেটিস যে সামান্যপ্রত্যয়ের পরিকল্পনা দিয়ে গিয়েছিলেন, প্লেটোর এই প্রত্যয়বাদ তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত। প্রত্যেক জিনিসের সর্বজনীন রূপটি শ্রেণীগত সত্য, কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক জিনিসেরই মাঝে তা বর্তমান। এই সর্বজনীন রূপটিকে না জানলে জিনিসটিকে পরিপূর্ণরূপে জানা যায় না। আর এই সর্বজনীন রূপটিকে ভাষায় প্রকাশ করাই সামান্য-কাজ বলে সামান্যপ্রত্যয়ও সর্বজনীন। এইবার প্লেটোর প্রশ্ন হল, এই সর্বজনীন রূপটির প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা যখন কোনো একটা জিনিসকে দেখি, তখন কি সেই জিনিসটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বজনীন রূপটাকেও চর্মচক্ষে দেখতে পাই? তা হয়তো পাই না। যখন একটা ঘোড়া দেখি, তখন সেই নির্দিষ্ট ঘোড়াটারই মেরুদণ্ড দেখি, চারটে পা দেখি, সেই ঘোড়াটাই যে উদ্ভিজ্জভোজী

তাই শুধু দেখি। ঐ ঘোড়াটাকে দেখবার সময় এমন কোনো সর্বজনীন ঘোড়া তো আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না যেটা এই নির্দিষ্ট ঘোড়া থেকে ভিন্ন, যে ঘোড়াটা আমার তোমার-তার ঘোড়া নয়, যে ঘোড়াটা সর্বদেশের সর্বকালের। কথাটা সত্যি, আর ঐ সর্বজনীন রূপটিকে আমরা চর্মচক্ষে দেখি না বলেই সে রূপ সর্বদেশের সর্বকালের ঘোড়ার রূপ হতে পেরেছে। আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিসগুলো জানছি সেগুলোর পরিবর্তন অতি স্পষ্ট, তাই সেগুলো অনিত্য, তাই সেগুলোকে আমরা চিরসত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু সর্বজনীন রূপ এবং তাকে নিয়ে গড়ে ওঠে যে সামান্য প্রত্যয়, সে তো অনিত্য নয়। আজ একটি ঘোড়াকে যেমন ঘোড়ার সামান্যপ্রত্যয় ছাড়া জানতে পারি না, তেমনি বহুযুগ পূর্বে, প্লেটো-সক্রেটিস-থালেসরাও বহু পূর্বে মানুষ জানতে পারত না, আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ ঘোড়ার সামান্যপ্রত্যয়ের জ্ঞান ছাড়া ঘোড়াকে আমরা ঘোড়া বলে যে জানতেই পারি না, সে আমরা দেখেছি। তবে সামান্য প্রত্যয়ের স্বরূপ দেখে এটা বেশ বোঝা যায় যে সামান্যপ্রত্যয়ের মধ্যে যে সত্যতা রয়েছে তা শুধু মানসিক সত্যতা, তা শুধু মানুষের পক্ষে সত্য, কেননা মানুষের মন এই সামান্যপ্রত্যয় ছাড়া কোনো জিনিসকে জানতে বুঝতে পারে না। মানুষের মন যেন তার নিজের সুবিধার জন্য সর্বজনীন রূপটির একটি নাম দিয়ে দিয়েছে, যে নামটার সাহায্যে তার ভাবনা তার চিন্তাধারা বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে পারে। যদি মানুষ না থাকত, যদি মানুষের মন না থাকত, তবে এগুলোর কোনো সার্থকতা থাকত কিনা বলা কঠিন। কিন্তু প্লেটো এই সামান্যপ্রত্যয়কে দিলেন এক বাস্তব সত্তা এবং এই বাস্তব সত্তাময় সামান্যপ্রত্যয়ের নামকরণ করলেন **প্রত্যয়** (Idea)। এই প্রত্যয়গুলি আছে, মানুষের মনের অন্তর্গত হয়ে নয়, এক আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে 'আছে' বললেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে, কোথায় আছে? প্রত্যয়ের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন নিরর্থক। অস্তিত্ব দুরকমের—ভৌতিক এবং তাত্ত্বিক। আমরা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে যে জিনিস-

গুলোকে পাই, তাদের আছে ভৌতিক অস্তিত্ব—তারা একটা না একটা দেহ নিয়ে, কোনো না কোনো একটা জায়গায় কোনো-না-কোনো একটা সময়ে বিদ্যমান। কিন্তু তাত্ত্বিক অস্তিত্ব যাদের, তাদের সম্বন্ধে এ-কথাগুলো খাটে না। তারা কোনো জায়গায়, কোনো কালে, কোনো একটা ভৌতিকরূপে বিদ্যমান থাকে না। যেমন, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মের কথা বলা যেতে পারে। ব্রহ্মের কোনো ভৌতিক রূপ নেই, কোনো কাল বা দেশের মধ্যে তার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যয়গুলির আছে এই তাত্ত্বিক অস্তিত্ব। কোথায় আছে, কখন আছে, কি রূপে আছে—এই প্রশ্নগুলি তাদের সম্বন্ধে একেবারে অবান্তর। এই তাত্ত্বিক অস্তিত্বই সবচেয়ে বড় ধরনের অস্তিত্ব। ভৌতিক অস্তিত্বময় জগতের বস্তুগুলি পরিবর্তনশীল—তারা আজ আছে, কাল থাকবে না, আজ এক রূপে আছে, কাল সে রূপে আসবে পরিবর্তন। কিন্তু তাত্ত্বিক অস্তিত্বময় প্রত্যয়গুলি চিরন্তন, অবিকারী, সবকালে একই রূপে বিদ্যমান।

পৃথিবীতে যা কিছু আমরা দেখি শুনি জানি, তা এই প্রত্যয়ের ছায়া, প্রত্যয়ের অনুলিপিমাত্র। কোনো জিনিসকে দেখে ছবি আঁকলে সেই জিনিসটির সঙ্গে ছবিটির ঠিক যতখানি পার্থক্য, প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয়ের অন্তর্গত জিনিসটিরও ঠিক ততখানি পার্থক্য। জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের এক একটি প্রত্যয় আছে, যেমন চেয়ার টেবিল ঘোড়া গোরু মানুষের প্রত্যয় চেয়ারত্ব, টেবিলত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব—এমনি আরো কত কি! এমন কি, বদান্যতা, সততা, বীরত্ব এই যে ভাবগুলি, এদেরও প্রত্যয় আছে। জগতে যে ঘোড়া গোরু চেয়ার টেবিল মানুষকে দেখি, সততা বীরত্বের যেসব অভিব্যক্তি দেখি—তারা তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের ছায়া মাত্র।

বিশ্লেষণে দেখা যায় প্লেটোর মতে এই প্রত্যয়গুলির তিনটি গুণ আছে। প্রত্যেকটি প্রত্যয় একক; যেমন মনুষ্যত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি। মানুষের বা সুন্দরের সম্বন্ধে দুরকমের দুটি প্রত্যয় নেই। 'মনুষ্যত্ব' এই প্রত্যয়ের মধ্যে

প্রত্যেক নির্দিষ্ট মানুষ জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে পড়বে; 'সৌন্দর্য' এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তু। প্রত্যয়গুলি চিরন্তন এবং অবিকারী। প্রত্যেক মানুষ জন্মায় ও মরে। কিন্তু 'মনুষ্যত্ব' এই প্রত্যয়টির কোনো জন্ম নেই, ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই প্রত্যয়গুলো সকলেই নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। যা কিছু দোষ, অপূর্ণতা, তা আছে প্রত্যয়ের অনুলিপি যে-সকল জাগতিক বস্তু তাদের মধ্যে। যে গাছটিকে দেখে ছবি আঁকা যায়, সে গাছটির মত পরিপূর্ণ হতে, নিখুঁত হতে কখনোই পারে না। গাছের ছবি হিসেবে হয়তো সে নিখুঁত, কিন্তু গাছ হিসেবে কখনই নয়। কেননা সেটা গাছের অনুলিপি ছাড়া আর তো কিছুই নয়।

সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় যা তার নাম প্লেটো দিয়েছেন (good)। **শিবম্** বলতে যা বোঝা যায়, এই গুড-ও অনেকটা তাই বোঝায়। শিবম্-এর প্রভাবে সমস্ত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব প্রভাবান্বিত। শিবম্ আছে ব'লেই প্রত্যয়গুলিও আছে। শুধু তাই নয়, শিবম্-এর আলোকে তারা আলোকিত ব'লেই তাদের আমরা জানতে পারি, ঠিক যেমন জগৎকে আমরা দেখতে পাই যখন সে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। প্লেটোর মতে এই শিবম্ এবং ঈশ্বর এক কি না, তাই নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। তবে এ পর্যন্ত বলা যায় যে, প্লেটো পরিষ্কার ক'রে লিখে না গেলেও শিবম্-এর যে-সকল বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন এবং জায়গায় জায়গায় ঈশ্বরের উল্লেখ ক'রে তাঁকে যে-সব বিশেষণে ভূষিত করেছেন, তার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই মনে হয়, শিবম্ এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে একই ছিল।

এই তো গেল তাত্ত্বিক জগতের প্রত্যয়। কিন্তু এর সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ আছে? সম্বন্ধ এক দিক দিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ, কারণ মানুষের আত্মা এই জগতের অধিবাসী। আত্মা সর্বদাই এই ঊর্ধ্বলোকে, এই সত্যের জগতে ফিরে যেতে চায়—কিন্তু ভৌতিক দেহ এবং তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব কামনা-বাসনা, তারা তাকে

নানাবিধ বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখে, নানাবিধ প্রভাবে মুগ্ধ মূঢ় ক'রে ফেলতে চায়। অমরালোকের আত্মা—সে যে এই নিম্নমুখী প্রভাবে পড়ে না, তা নয়; তাই মানুষের আত্মার মধ্যে দুটি বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হয়। একটির গতি হ'ল নিম্নাভিমুখে, ভৌতিক জগতের অবারিত সুখসম্ভোগের দিকে—আরেকটির গতি হ'ল উর্ধ্বমুখে, সত্যশিবসুন্দরের তাত্ত্বিক জগতে বিরাজ ক'রে যে আনন্দ লাভ করা যায় তার প্রতি। এই দুটি শক্তির মাঝে রয়েছে আরেকটা শক্তি। এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের শৌর্য যার কর্তব্য হ'ল নিম্নাভিমুখী শক্তির দাবীকে দমিয়ে মানিয়ে উর্ধ্বমুখী শক্তির নির্দিষ্ট পথে আত্মাকে নির্দ্বন্দ্বে চলবার শক্তি দেওয়া। আত্মার এই প্রকাশের নাম তিনি দিলেন **তৃষ্ণা** (Appetite), **বিবেক** (Reason), **শৌর্য** (Spirit)। শৌর্যের সহায়তায় তৃষ্ণার কোলাহলকে থামিয়ে বিবেকরূপী আত্মা যখন কামনা-বাসনার বন্ধনমুক্ত হয়ে তাত্ত্বিক জগতের প্রত্যয়ের ধ্যানে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারে, তখনই তার জীবনের চির-অভীপ্সিত শ্রেয় দেখা দেয় সকল শূন্যতা পূরিয়ে।

র‍্যাফেলের একটি বিখ্যাত কার্টুন ছবি আছে—প্লেটো চেয়ে আছেন স্বর্গের পানে, আর অ্যারিস্টটলের দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে। প্রত্যয়ের তাত্ত্বিক জগৎ ভৌতিক জগতের চেয়ে ভিন্ন এবং বেশী সত্য ব'লে এইজগৎকে জানাই দর্শনের প্রধান কর্তব্য। প্লেটোর এই মতবাদ দর্শনকে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে যেন অনেক দূরে নিয়ে গেল। দর্শনের শুরুই হয়েছে আমাদের প্রতিদিনকার চেনাশোনা জগৎটাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু প্লেটোর প্রত্যয়বাদ জগৎকে—আমাদের প্রাত্যহিক জগৎকে—ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হ'ল না। প্রত্যয়ের জগৎ তাঁর কাছে এত বেশী সত্য হয়ে উঠল যে আমাদের চেনাশোনা জগতের কোনো বাস্তব সত্তা আছে ব'লে তিনি মানতে চাইলেন না। কিন্তু পৃথিবীকে দেখার চোখ নিয়ে **আরিস্টটল** সেই

কথাটাই মেনে নিলেন। আমাদের এই জগৎটার বাস্তব সত্তা আছে, এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর সত্যতা আছে—তারা কেবলমাত্র প্রত্যয়ের ছবি নয়, এই সত্যকে প্রমাণ করাই হ'ল আরিস্টটলের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। আরিস্টটলের কাছ থেকে তাই দর্শন আবার পেল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে সফল করবার প্রেরণা।

জগতের মধ্যে পরিবর্তন আছে, তাই তার সম্বন্ধে ধ্রুবজ্ঞান লাভ করা যায় না। সেইজন্য প্লেটো বিকারহীন পরিবর্তনাতীত প্রত্যয়ের জ্ঞানকেই সত্যিকারের জ্ঞান ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আরিস্টটল প্রশ্ন তুললেন, এই যে অবিকারী পরিবর্তনাতীত প্রত্যয়— এরা কি ক'রে পরিবর্তনশীল জগৎকে সৃষ্টি করতে পারবে? আমাদের চেনাশোনা প্রতিদিনকার ভৌতিক পৃথিবী যদি তাত্ত্বিক জগতের গতিহীন প্রত্যয়ের ছবিই হয়, তবে এ পৃথিবীর মধ্যেই বা গতি দেখা যাবে কেন? যার ছবি এই পৃথিবী, ঠিক তার মতই সেও তো গতিহীন হবে। তা ছাড়া আরো একটি প্রশ্ন আছে। এই প্রত্যয়, এর প্রকৃত রূপ কি? ঠিক যে গুণের জন্য, যে সর্বজনীন রূপের জন্য, কোনো একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট রূপ নিতে পেরেছে, সেই গুণটিই প্রত্যয়। যেমন, অশ্বত্ব। যখন আমরা বলি 'এটা একটা ঘোড়া', তখন শুধু সেই ঘোড়াটিকে জানা ছাড়া আমরা আরো একটি ঘোড়াকে জানি— সেটা হচ্ছে সর্বজনীন ঘোড়া, মানে ঐ অশ্বত্ব। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে একটা ঘোড়াকে জানতে গেলে আমাদের দুটো ঘোড়াকে জানতে হয়— একটা নির্দিষ্ট ঘোড়া যেটাকে আমরা এখন এখানে দেখছি, আরেকটা সর্বজনীন ঘোড়া যেটা তাত্ত্বিক জগতে বিরাজ করে। এ দুটো পরস্পর থেকে পৃথক। কিন্তু এই যে প্রকৃত গুণ বা সর্বজনীন রূপ—এ কি নির্দিষ্ট ঘোড়াটি ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে? প্লেটো বলেন, থাকতে পারে এবং তা তাত্ত্বিক জগতে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি পারে? একটি

বস্তুর যেটা সর্বজনীন রূপ বা গুণ, যে রূপটির জন্য সে একটা বস্তু ব'লে পরিগণিত হতে পেরেছে, সেই রূপটি কি কখনো সেই বস্তুটির থেকে পৃথক হয়ে থাকতে পারে? বস্তুটির মধ্যে সেই গুণটি নিহিত রয়েছে ব'লেই তো বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট রূপ নিতে পেরেছে। আর নির্দিষ্ট বস্তুটি ছাড়া তার সর্বজনীন রূপ কোথাও থাকতে পারে না। সে তো আর শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। একটি আধারে তাকে আশ্রয় নিতেই হবে। ঘোড়া ছাড়া অশ্বত্ব থাকবে কেমন ক'রে? ঘোড়ার মধ্য দিয়েই তার অন্তর্নিহিত অশ্বত্বকে জানছি এবং অশ্বত্বকে জানার মধ্য দিয়ে তার আধার যে নির্দিষ্ট ঘোড়া তাকেও জানছি। এই দুটি জানাই একসঙ্গে হয়। এবং দুটো জানাই সমানভাবে সত্য। নির্দিষ্ট ঘোড়ার চেয়ে অশ্বত্ব যে বেশী সত্য, এ কথা কল্পনা করবার কোনো সার্থকতা নেই।

প্লেটোর প্রত্যয়বাদের এই সমালোচনার ওপরেই গ'ড়ে উঠল অ্যারিস্টটলের **দার্শনিক** মতবাদ। তিনি দেখলেন যে জগতের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বস্তুকেই সত্য ব'লে মেনে নেওয়া দরকার। কেননা তার মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে ব'লেই সর্বজনীন গুণটিও অর্থাৎ সেই বস্তুটির প্রত্যয়ও সত্য হচ্ছে। এই নির্দিষ্ট বস্তুর প্রকৃত রূপ কি? একটি মানুষকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে তার মধ্যে দুটি জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে—একটি তার রক্তমাংসে গড়া দেহ, আরেকটি তার মনুষ্যত্ব, তার সর্বজনীন গুণগত রূপ যেটাকে আমরা তার প্রত্যয় বলি। শুধু রক্তমাংসে গড়া দেহটিকে আমরা মানুষ বলি না; আবার শুধু মনুষ্যত্বকেও আমরা মানুষ বলতে পারি না। অ্যারিস্টটল প্রথমটির অর্থাৎ ভৌতিক রূপের নাম দিয়েছেন Matter বা **উপাদান**; দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ তাত্ত্বিক রূপকে বলেছেন Form বা **গুণগত রূপ** বা শুধু **রূপ**, অর্থাৎ গুণটির জন্য উপাদান কোনো একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে পেরেছে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট বস্তুই এই উপাদান এবং গুণগত রূপের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়। এই দুটির একটিকেও যদি বাদ দিই, তবে যে কেবল নির্দিষ্ট

জিনিসটিই তৈরি হবে না তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুটির প্রত্যেকটিই নিরর্থক হয়ে পড়বে। আর এই দুটিকে নিয়ে গ'ড়ে ওঠে যে নির্দিষ্ট জিনিসটি, জগতে সে-ই সত্য। শুধু কেবল উপাদানকে যেমন সত্য বলা চলে না, তেমনি প্রত্যয়কেও সত্য বলা চলে না।

নির্দিষ্ট বস্তুকে তৈরি করতে হলে উপাদান এবং গুণগত রূপ ছাড়া আরো দুটি জিনিসের প্রয়োজন—একটি শক্তি, আরেকটি উদ্দেশ্যের পরিকল্পনা। উপাদান আছে এবং গুণগত রূপও আছে—কিন্তু এমন একটি শক্তির দরকার যে ঐ গুণানুযায়ী উপাদানকে নির্দিষ্ট রূপের ছাঁচে ফেলবে। যেমন, মাটি আছে এবং কলসির গুণগত রূপ আছে। একজন কুম্ভকারের প্রয়োজন যে তার শক্তি দিয়ে মাটিকে এই গুণানুযায়ী কলসিতে পরিণত করবে। সঙ্গে সঙ্গে কিসের জন্য কুম্ভকার মাটিকে কলসিতে পরিণত করছে, তারও একটা ধারণা থাকবে—এইটেই হচ্ছে উদ্দেশ্যের পরিকল্পনা। সব কিছুই একটা না একটা উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে। কোনো একটা জিনিসকে তৈরি করতে গেলে সে জিনিসটা কি উদ্দেশ্যকে সফল করবে তার একটা ধারণাও প্রথম থেকেই কাজ করে।

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে যে-কোনো বস্তুর সৃষ্টির মূলে এই চার রকম কারণ রয়েছে—**উপাদান কারণ** বা material cause (যে উপাদান দিয়ে জিনিসটা তৈরি হবে); **প্রকারক কারণ** বা formal cause (যে গুণগত রূপের ধারণা-অনুযায়ী উপাদানকে আকার বা প্রকার দেওয়া হবে); **নিমিত্ত কারণ** বা efficient cause (যে কর্তা শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা উপাদানকে গুণগত রূপের অনুযায়ী করে তুলবে); **উদ্দেশ্যগত কারণ** বা final cause (যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য জিনিসটিকে তৈরি করা হবে)। বস্তুর কারণ এই চাররকমের হলেও প্রথম দুটিই অ্যারিস্টটলের মতে আসল।

এখন মনে হতে পারে যে উপাদান এবং গুণগত রূপ, এরা একেবারে আলাদা হয়ে থাকে। কেউ যখন বাইরে থেকে উপাদানের ওপর গুণগত রূপের

ছাপ মেরে দেয়, তখনই নির্দিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য আরিস্টটল স্বীকার করেন নি। পাথর থেকে যে মর্মরমূর্তি তৈরি করা হবে, সে মর্মরমূর্তির দুটি অবস্থা আছে—**প্রচ্ছন্ন-অবস্থা** (potential state) ও **প্রকট-অবস্থা** (actual state)। প্রচ্ছন্ন অবস্থায় যখন মর্মর-মূর্তি থাকে তখন সে শুধু পাথর বা মূর্তির উপাদানরূপে থাকে। কিন্তু সে কি তখন শুধুই উপাদান, শুধুই পাথর? তা নয়, সেই পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে মূর্তির গুণগত রূপটি—গুণগত রূপটি যেন উপাদান-অবস্থায় প্রতীক্ষা করছে তার পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য। এবং মূর্তিটি যখন তৈরি হল, তখন আর কিছুই হল না, শুধু ঐ গুণগত রূপ প্রকাশিত হল, প্রকট হল, বাস্তবতা পেল। সুতরাং কোনো উপাদানই শুধু কেবল উপাদান নয়, সে গুণগত রূপের প্রচ্ছন্ন-অবস্থা; আবার কোনো গুণগত রূপই কেবল নিছক গুণগত রূপ নয়—সে উপাদানের প্রকট-অবস্থা, উপাদানের নির্দিষ্ট আকার পাওয়া রূপ, অপরিণত উপাদানের পরিণত মূর্তি। তাই এ কথা বলা চলে না যে উপাদান শুধু কেবল উপাদানমাত্র এবং কর্তা যখন সে উপাদানের ওপর গুণগত রূপের ছাপ মেরে দেয় তখনই কেবল তা গুণগত রূপের সংস্পর্শে আসে, একটা নির্দিষ্ট আকার পায়। কর্তার কাজ, উপাদানের ওপর গুণগত রূপের ছাপ মারা নয়—উপাদানের মধ্যে যে গুণগত রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাকে প্রস্ফুট করা, তাকে প্রকাশিত করা।

পৃথিবীর সব কিছুই এই দুটি জিনিস নিয়ে তৈরি—যা সে এখনো হয় নি কিন্তু হবে, আর তার তাই হওয়া। বস্তু যখন প্রথম অবস্থায় থাকে, যখন সে কিছুই হয় নি কিন্তু একটা কিছু হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে—এটা বেশ বোঝা যায় যে তখন বস্তুটি নিথর নিস্পন্দ হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না। যা সে হয় নি কিন্তু হবে, তা যেন তাকে টানে, দুর্বার আকর্ষণে টানে—তার দিকে এগিয়ে যাবার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বস্তুটির মধ্যে দেখা দেয় এবং এই আবেগের প্রেরণাতেই

সে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, গতি কখনো বাইরে থেকে আসে না। কোনো কিছুকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যে দেয় সে তারই মধ্যে নিহিত চরম শেষের আবছায়া রূপটি। প্রত্যেকটি বস্তুই আপনা থেকেই এগিয়ে যেতে চায় তার এখনো-না-পাওয়া পরিণতির দিকে। তাই যা সে এখনো হয় নি কিন্তু হবে, আর সে যখন তা হল, অর্থাৎ বস্তুর অপরিণত অবস্থা ও পরিণত মূর্তির মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই—এ দুটির মাঝে যোগসূত্রের মত বিরাজ করে চরম পরিণতির আকর্ষণ আর সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ যার প্রেরণায় সে ঐ আকর্ষণে সাড়া দেয়, এগিয়ে যায় ক্রমাগত অপরিণতির থেকে পরিণতির দিকে।

এই এগিয়ে-যাওয়া জগতে রয়েছে বলেই জগতের উঁচু স্তরের বস্তু এবং নিচু স্তরের বস্তুর মধ্যে কোনো অনতিক্রমণীয় ভেদ নেই। ক্রমবিবর্তনের ফলেই নিচু স্তরের বস্তু উঁচু স্তরের বস্তুতে পরিণত হয়। নিচু স্তরের বস্তু মানেই উঁচু স্তরের বস্তুর অপরিণত অবস্থা, আর উঁচু স্তরের বস্তু মানেই নিচু স্তরের বস্তুর পরিণত মূর্তি। এ দুটির মাঝে যোগসূত্র রয়েছে নিচু স্তরের বস্তুর উঁচু স্তরের দিকে এগিয়ে যাবার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। জড় পদার্থ ও অজড় পদার্থের মধ্যে তাই কোনো দুর্মোচনীয় বিভেদ নেই। আর, তা নেই বলেই জড় ও অজড় পদার্থকে নিয়ে যে জগৎ তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা সুন্দর উর্ধ্বমুখীন ক্রমবিবর্তনের একটানা ধারা যার কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই, তালভাঙা নেই।

এই ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জগৎ এমনি করে অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলেছে একটি উদ্দেশ্যকে সফল করতে, বাস্তবতায় রূপান্তরিত করতে। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজ্ঞার পূর্ণতম প্রকাশ। প্রথমে ছিল জড় পদার্থ, ধীরে সে রূপান্তরিত হল অজড় পদার্থে, যার মধ্যে জেগে উঠল জীবনের স্পন্দন—এল তরুলতাপাতা—তারপর এল পশুপাখি। কিন্তু জগতের এগিয়ে চলা থামল না।

জীবজন্তু বিবর্তিত হল মানুষে। মানুষের মধ্যেই প্রজ্ঞা—যা এতদিন ছিল অস্ফুট, অব্যক্ত, তা ব্যক্ত হল, প্রকাশ পেল মানুষের বিচারবুদ্ধির মধ্য দিয়ে। জগতের অবিরাম এগিয়ে-চলার উদ্দেশ্য সফল হল।

সফল হল, কিন্তু আংশিক ভাবে। কারণ, মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। মানুষ দেহপিঞ্জরে বন্দী, তার জড়দেহটা প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রকাশের পথে বিঘ্ন। মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এই জড়দেহের ক্লীবতাকে ঘুচিয়ে প্রজ্ঞাকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা, প্রজ্ঞার নির্দেশ-অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করা। এই কর্তব্যকে সফল করে তোলার মধ্যেই রয়েছে মানুষের চিরকাঙ্ক্ষিত আনন্দ।

প্রজ্ঞার এই আংশিক অভিব্যক্তি পূর্ণতা পায় **ঈশ্বর**-এর মাঝে। তাই জগতের অবিরাম এগিয়ে-চলার শেষ নিশানা তিনি। কোনো জড়পদার্থের দ্বারা ঈশ্বর বন্দী নন—চিন্ময়, পরিপূর্ণরূপে চিন্ময় তাঁর রূপ। আমরা দেখেছি অ্যারিস্টটল গুণগত রূপ এবং উপাদানের সম্মিলনে উদ্ভূত বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন; কিন্তু ঈশ্বরের বেলা উপাদানের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—উপাদান সব সময়েই জড়াত্মক; যে গুণগত রূপ চিদাত্মক সত্তাময়, ঈশ্বরের শুধু সেই রূপই আছে। এই কারণে অ্যারিস্টটল ঈশ্বরকে **বিশুদ্ধ রূপ** (Pure Form) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মাঝে তো আর জড় কিছু থাকতে পারে না, অণুপরিমাণেও থাকতে পারে না। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন। তাঁর অস্তিত্ব তাত্ত্বিক, উপাদান ও গুণগতরূপের সম্মিলনে সৃষ্ট বস্তুর ভৌতিক অস্তিত্ব নয়।

গুণগত রূপ হতেই আসে গতি, কারণ উপাদান তার অন্তর্নিহিত গুণগত রূপকে প্রকাশ করতে চায় বলেই তার মধ্যে জাগে চাঞ্চল্য। এই গুণগত রূপকে প্রকাশ করাই উপাদানের চরম লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য। তাই গুণগত রূপ ও উদ্দেশ্য এক। জগতের উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করা, প্রজ্ঞাই জগতের অন্তর্নিহিত

গুণগত রূপ যাকে প্রকট করে তুলবার জন্য জগতের অনিবার এগিয়ে-চলা। ঈশ্বরের মাঝেই প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রকাশ বলে ঈশ্বরই জগতের অন্তর্নিহিত গুণগত রূপ এবং তারি জন্য জগৎ এগিয়ে চলার প্রেরণা পায় ঈশ্বরের কাছ থেকে। অপরিপূর্ণ জগৎ ঈশ্বরকে লাভ করে পরিপূর্ণ হতে চায় বলেই সে এগিয়ে চলে। এমনি করে ঈশ্বর জগৎকে টেনে আনেন তাঁর দিকে—ঈশ্বর জগৎকে দেন গতি, এগিয়ে-চলার প্রেরণা। কিন্তু এই প্রেরণা দিতে গিয়ে ঈশ্বর নিজে কখনো কোনোরকমেই চঞ্চল হন না। তিনি চঞ্চল হবেন কেন! তিনি যে পরিপূর্ণ—অপূর্ণতার বেদনা থাকলেই না তবে কোনো কিছুর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে সেই অপূর্ণতা দূর করবার জন্য। ঈশ্বর তাই জগৎকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছেন তাঁরই পানে, কিন্তু এই দুর্নিবার টানার কাজে তাঁর মধ্যে বিচলন জাগে না এতটুকুও।

অস্তাচলে

আরিস্টটলের মধ্যেই গ্রীকদর্শন লাভ করল তার চরম পরিণতি। এর পর গ্রীকদর্শনের রূপটা গোধূলির আকাশের মত। অস্তমিত সূর্যের শেষ কয়েকটা রক্তিম রশ্মি যেমন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পশ্চিম আকাশটাকে রঙের আলোয় উজ্জ্বল করে রাখবার ক্ষীণ চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি করে গ্রীকদর্শনের ভাবচ্ছটা নিয়ে তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায় গ্রীকদর্শনের আলোকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্রতী হলেন। কিন্তু তাঁদের শক্তি ছিল ক্ষীণ, তাই চেষ্টাও তাঁদের ব্যর্থ হল। এই তিনটি সম্প্রদায়ের নাম, **স্টোয়িক** (Stoic), **এপিকিউরিয়ান** (Epicurean) ও **স্কেপ্‌টিক** (Sceptic)। মানুষের শ্রেয় কি, তাই আবিষ্কার করা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও জগৎ কোথা থেকে এল, এ প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা দিয়েছেন এবং সেই উত্তরের সাহায্যেই তাঁরা যে যাঁর নিজের মতানুসারে বিচার করেছেন মানুষের শ্রেয় কি।

প্লেটোর সঙ্গে সঙ্গে যে সমন্বয়ের যুগ আরম্ভ হল তার প্রচেষ্টা হল প্রাকৃতিক জগৎ ও মানুষকে মিলিয়ে যে সত্য বিরাজ করে সেই সত্যকে আবিষ্কার করা। এই সমন্বয়ের চেষ্টায় প্লেটো বিফল হয়েছেন, অ্যারিস্টটল তা দেখিয়ে দিলেন। প্লেটোর প্রত্যয়বাদ যেন একচক্ষু—প্রত্যয় তাঁর কাছে এত বেশী সত্য হয়ে উঠল যে তিনি জগৎকে প্রত্যয়ের অনুলিপি বলে তার যথার্থ সত্তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। অ্যারিস্টটল দেখালেন যে শুধু প্রত্যয় কখনো সত্যি হতে পারে না, কারণ প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে গুণগত রূপ এবং গুণগত রূপ যতক্ষণ পর্যন্ত না উপাদানের মধ্য দিয়ে আপনাকে মূর্ত করে ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোনো বাস্তবতা থাকতে পারে না। তাই উপাদান এবং গুণগত রূপ, দুটোই তাঁর কাছে সমানভাবে সত্য হল। কিন্তু তিনিও কি তাঁর এই মত শেষ পর্যন্ত যথাযথভাবে অনুসরণ

করেছেন? করেন নি, এই কথাটাই প্রমাণ হয় তাঁর ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিশ্লেষণে। ঈশ্বর গুণগত রূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি; তাঁর এই অভিব্যক্তির জন্য কোনো জড়পদার্থ বা উপাদানের প্রয়োজন হয় না। উপাদান ছাড়াই তিনি পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত বলে তিনি কিন্তু অর্থহীন হয়ে যান না, যেমন করে জগতের কোনো বস্তুর গুণগত রূপ অর্থহীন হয়ে যায় যদি সে আপনাকে কোনো উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না করে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সত্তা এবং জগতের সত্তার মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের আছে তাত্ত্বিক সত্তা, কিন্তু জাগতিক দ্রব্যাদির আছে ভৌতিক অস্তিত্ব। প্লেটো তাঁর প্রত্যয়বাদের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—তাত্ত্বিক সত্তা আছে বলেই প্রত্যয়গুলি সত্য—জগতের মধ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে সে অপূর্ণতা প্রত্যয়ের মধ্যে নেই বলেই প্রত্যয়গুলি জগতের চেয়েও বেশী সত্য! আরিস্টটল যখন বললেন, অসম্পূর্ণ জগৎ তার পরিপূর্ণতা লাভ করবার জন্য ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায় অনিবার গতিতে, তখন কি প্লেটোর মতটাই তাঁর মধ্যে ভাষা পেল না?

সমন্বয়-যুগের প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। পরম সত্য যে, তাকে হয়তো পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁর পূর্ণতম চিৎসত্তার কাছে অচিৎপদার্থ ম্লান ম্রিয়মান হয়ে গেল—সেই সত্তাই যেন আপনার ভাস্বর মহিমায় একক সত্য হয়ে রইল। সুতরাং এ কথা বলা বোধ হয় সংগত হবে না যে প্লেটো-অ্যারিস্টটল সেই সত্যকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন যে সত্য জগৎ এবং মানুষ—অপূর্ণতার প্রতীক যারা—তাদের মিলিয়ে বর্তমান, জগৎ এবং মানুষ যার মধ্যে পূর্ণরূপ সত্য হয়ে বিরাজ করে।

তাঁদের এই ব্যর্থতাই এবার এই গোধূলি-লগ্নের তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়কে প্রেরণা দিল নূতন করে সমন্বয়ের চেষ্টা করবার। প্লেটো-আরিস্টটলের বিফলতা দেখে তাঁরা ধরে নিলেন যে প্রকৃত সমন্বয় যদি করতেই হয় তবে চিৎ এবং অচিৎ

পদার্থের একটাকে না একটাকে বাদ দিতে হবে, কেননা এ দুটোকে মিলিয়ে বর্তমান এমন কোনো পরম সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে **স্টোয়িক** সম্প্রদায় জড়পদার্থময় যে জগৎ তার কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, কোনো স্বগত অর্থ নেই, এ কথা ঘোষণা করলেন। যে পরম সত্য এই জগৎকে প্রতিনিয়ত ধারণ করছে, তাকে সত্যতা ও অর্থ দিয়েছে—সে চিৎ, পূর্ণরূপে চিন্ময় তার সত্তা। এই পরম সত্যই মানুষের মাঝে প্রকাশিত হয় প্রজ্ঞার ভিতর দিয়ে; তাই প্রজ্ঞার অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে মানুষের চরম শ্রেয়।

এপিকিউরিয়ান সম্প্রদায় ঠিক এর উল্টো মতটাকেই প্রচার করে বললেন যে চিন্ময় পরম সত্যের কোনো অস্তিত্বই নেই—জড়পদার্থের জগৎটাই একমাত্র সত্য। পরমাণুদের সম্মিলন থেকেই জগতের সৃষ্টি—এই সম্মিলনের মূলে চিৎ সত্তার কোনো প্রভাব, কোনো নির্দেশ নেই। এই মতবাদ তার চরম পরিণতি লাভ করল তাঁদের শ্রেয়ের পরিকল্পনায়—মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেয় রয়েছে সুখসম্ভোগে, দুঃখবেদনা অতৃপ্তির স্পর্শমুক্ত সুখসম্ভোগে।

পরম সত্য সম্বন্ধে কত মত—আর তাদের মধ্যেই আবার কত বিরোধ! এই দেখে **স্কেপ্‌টিক** সম্প্রদায় বললেন, পরম সত্য সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানা যায় না। জগৎ প্রকৃতপক্ষে কি, কোথা থেকে এল—এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাবে না কোনো দিনই, কোনো রকমেই। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই হোক আর প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানই হোক, কিছুই মানুষকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম করে না। বস্তুর সম্বন্ধে মানুষ শুধু জানতে পারে, তারা আছে; জানতে পারে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যে সব সম্বন্ধ আছে সেগুলিকে। এই যে জানা, এও আবার সম্পূর্ণ নয়, ধ্রুব নয়—এ শুধু লৌকিক ধারণা। আজ এ সত্য বটে, কিন্তু কাল হয়ে যাবে মিথ্যে। তাই জীবনের লক্ষ্য হবে শুধু এই কথাটিকে স্বীকার করা যে চিরসত্য বলে, ধ্রুব সর্বজনীন ব'লে কোনো জ্ঞানই নেই।

প্রকৃত গ্রীক দর্শন বলতে যা বোঝায়, তার সমাপ্তি হ'ল এখানে। কিন্তু এ কী সমাপ্তি! এ যেন রাত্রির মত স্তব্ধ, নিরাশার অন্ধকারে লীন! একদিন মানুষ কত আশা নিয়ে শুরু করেছিল তার দার্শনিক অভিযাত্রা--ভেবেছিল, সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে এই বিশ্বভুবনকে জানবে বুঝবে—কোন্ সত্তা রয়েছে এর অন্তরালে, তাকে খুঁজে বার করবে! কিন্তু সে আশাপ্রাণিত যাত্রায় যেন পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল এই স্কেপ্‌টিক সম্প্রদায়। মানুষের বিচারবুদ্ধির শক্তির ওপর ফেলে দিল অবিশ্বাসের অন্ধ-করা ছায়া। সত্যিই ঘনিয়ে এল দর্শনের রাত্রি—চরম সত্যের দিকে যাবার পথ সে পাবে না, এই নিরাশা যেন এবার তাকে অবসাদের ভারে শ্রান্ত নিথর তন্দ্রাতুর ক'রে দিল। কিন্তু, রাত্রিও প্রভাত হয়, আবার নূতন আশার কোলাহলে জগৎ জেগে ওঠে। পাশ্চাত্য দর্শনের সে প্রভাত এল আলেকজান্দ্রিয়া শহরে, প্রায় পাঁচশ' বছর পরে, **নিও-প্লেটোনিজম্**-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু এবার আর বিচার বুদ্ধি প্রজ্ঞাকে পাথেয় করে পথচলা শুরু হল না। পরম সত্যকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে পেতে গেলে ফল হয় শুধু মতবাদের বিরোধ। তাই পরম সত্যকে—এই জগৎসংসার যার থেকে আলোর কণার মত বিচ্ছুরিত হয়ে এসেছে—সেই পরম সত্যকে জানতে হবে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে নয়, প্রজ্ঞার সাহায্যে নয়, **বোধির** (Intuition) মধ্য দিয়ে—এই কথা ঘোষণা করলেন নিও-প্লেটোনিজম। বিচারবুদ্ধিপ্রজ্ঞার দর্শন নবরূপে উদ্বোধিত হল বোধির দর্শনে।

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ